আল-কোরআনের পরিচয়

মতিউর রহমান নিজামী

আল-কোরআনের পরিচয়

মতিউর রহমান নিজামী

প্রফেসর'স পাবলিকেশন্স
মগবাজার, ঢাকা।

আল-কোরআনের পরিচয়

মতিউর রহমান নিজামী

প্রকাশনায়ঃ
এ এম আমিনুল ইসলাম
প্রফেসর'স পাবলিকেশন্স
মোবাইলঃ ০১৭১১ ১২৮৫৮৬, ০১৫৫২ ৩৫৪৫১৯

প্রকাশকালঃ
প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল-১৯৯৭ইং
দ্বিতীয় প্রকাশ : অক্টোবর-২০০৩ইং
তৃতীয় প্রকাশ : সেপ্টম্বর-২০১২ইং

বর্ণবিন্যাস ও ডিজাইন :
প্রফেসর'স কম্পিউটার
আল ফালাহ্ ভবন

মুদ্রণে :
ক্রিসেন্ট প্রিন্টিং প্রেস
মগবাজার, ঢাকা।

ISBN : 984-31-1426-0

মূল্য : ৩০.০০ টাকা মাত্র

AL-QURANER PORICHOY BY MOTIUR RAHMAN NIZAMI PUBLISHED BY PROFESSOR'S PUBLICATIONS, BORO MOGH BAZAR, DHAKA-1217. PRICE TK. 30.00 ONLY.

সূচিপত্র

আল-কোরআনের পরিচয়

আল্লাহ্ এই বিশ্ব জাহানের স্রষ্টা, প্রতিপালক এবং মালিক। আসমান-জমিন তথা সৃষ্টিলোক তিনি এককভাবে পরিচালনা করেছেন। চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র থেকে শুরু করে বিশ্ব প্রকৃতির সর্বত্র যে এক সুনিয়ম সুশৃঙ্খল পরিবেশ বিদ্যমান এর মূল রহস্য এখানেই। সৃষ্টিজগতের সবকিছুই মহান স্রষ্টার নির্ধারিত বিধান মেনে চলেছে। সবকিছুই মহান আল্লাহর পবিত্রতা, শ্রেষ্ঠত্ব ও সার্বভৌমত্বের ঘোষণা দিয়ে যাচ্ছে। মানুষ ছাড়া সৃষ্টিজগতের সবাই এমনকি ফেরেশতাগণও এভাবে সদা সর্বক্ষণ আল্লাহর হুকুম তথা নির্ধারিত নিয়ম অনুসরণ করে চলতে বাধ্য। মানুষের দৈহিক অবয়বগুলো দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, প্রতিটি কোষও আল্লাহর নির্ধারিত নিয়মের অধীন। ব্যতিক্রম হলেই অশান্তির কারণ দেখা দিয়ে থাকে।

আল্লাহর এই প্রাকৃতিক নিয়ম কার্যকর নয় কেবল মানব-সত্তার জন্য। গোটা সৃষ্টিলোকের জন্য আল্লাহর নির্ধারিত প্রাকৃতিক বিধান স্বয়ং আল্লাহ্ কার্যকর করছেন। সৃষ্টিজগতের ছোট বড় কোন সৃষ্টির পক্ষেই তা লঙ্ঘন করার সুযোগ নেই, অবকাশ নেই। কিন্তু মানব-সত্তার জন্য আল্লাহ্ তায়ালা যে বিধান দিয়েছেন, সে বিধান মানা না মানার ব্যাপারে তাকে স্বাধীনতা বা স্বায়ত্তশাসন দেয়া হয়েছে। তাই মানব সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলার জন্য খোদা প্রদত্ত সে বিধান মানুষের সমাজে কার্যকর করার দায়িত্বও মানুষের উপরই অর্পিত হয়েছে। এই স্বাধীনতা ও স্বায়ত্তশাসন ক্ষমতার অপব্যবহার না করে আল্লাহর বিধান মানা ও কার্যকর করার প্রচেষ্টার মাধ্যমেই মানুষ আল্লাহর খলিফার মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়, প্রতিষ্ঠিত হয় সে আশরাফুল মাখলুকাতের সম্মানজনক আসনে।

পক্ষান্তরে আল্লাহ্ প্রদত্ত স্বাধীনতা স্বরূপ আমানতের খেয়ানত করে সে যদি তার মনগড়া বা তার মতই অন্য কোন মানুষের মনগড়া নিয়মনীতি আদর্শ বা মতবাদের অনুসরণ করে তাহলে সে স্বীয় কৃতকর্মের কারণে নিক্ষিপ্ত হয় ধ্বংসের অতল তলে। সৃষ্টির সেরা মানুষ নেমে যায় পশুত্বের কাতারে। এখানেই শেষ নয় সে নেমে যায় পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট স্তরে।

এভাবে মানুষের অবস্থা বিচার করলে দেখা যায়, মাটির এ পৃথিবীতে মানুষ বড় অসহায়, বড় বিপজ্জনক অবস্থায় প্রেরিত হয়েছে। মানুষের স্রষ্টা তাকে বড় পরীক্ষায়, কঠিন পরীক্ষায় ফেলেছেন। কঠিন এই অবস্থা, এই কঠিন পরীক্ষা অতিক্রম করেই তো সে নিজকে এই দুনিয়ায় আল্লাহর খলিফারূপে প্রতিষ্ঠিত করবে। মহান আল্লাহ নিজেই মানুষের অসহায় অবস্থার একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরেছেন মানুষের এ পৃথিবীতে পাঠাবার মুহূর্তে।

"যাও তোমরা পরস্পরে একে অপরের শত্রুরূপে, এই পৃথিবীতে তোমরা কিছুদিন বসবাস করবে, আর কিছু দ্রব্যসামগ্রীও ভোগ করবে।"

ছোট্ট এই কথা ক'টির মধ্যে সূক্ষ্ম অথচ সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে।

১. মাটির এ পৃথিবীতে মানুষের জীবনটা চিরস্থায়ী নয় বরং ক্ষণস্থায়ী, শুধু ক্ষণস্থায়ীও নয় এটা একটা অন্তর্বর্তীকালীন অবস্থা মাত্র। এরপর মহান স্রষ্টার কাছেই ফিরে যেতে হবে।

২. এই ক্ষণস্থায়ী জীবনে মানুষের ভোগ দখলে যা কিছু বিষয় সম্পদ থাকবে তাও ক্ষণস্থায়ী এবং নগণ্য মাত্র। আল্লাহর দেয়া স্বাধীন ইচ্ছা-শক্তির অপব্যবহারের ফলে এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের ক্ষণস্থায়ী স্বার্থ নিয়ে পরস্পরের মধ্যে শত্রুতার জন্ম নিবে, মানুষের ব্যক্তি-সমাজ জীবনের শান্তি বিনষ্ট হবে। প্রকৃতপক্ষে এটাই মানুষের জন্য চরম অসহায় অবস্থা।

মানুষের স্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাকে এ অবস্থা থেকে রক্ষা করে চির শান্তি ও কল্যাণের পথে পরিচালিত করবার জন্য তার নিজস্ব পরিকল্পনার একটা ব্যবস্থা করেছেন। মানুষকে দুনিয়ায় পাঠাবার মুহূর্তে সেই ব্যবস্থার কথাও তাকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে :

قُلْنَا اهْبِطُوْا مِنْهَا جَمِيْعًا ۚ فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّىْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَاىَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ- (البقرة:٣٨)

"অত:পর আমার পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি হেদায়েত পৌছাবে, যারা সেই হেদায়েতের অনুসরণ করবে তাদের ভয়ের কোন কারণ নেই, কারণ নেই দুশ্চিন্তারও।" (বাকারা : ৩৮)

মানুষকে অসহায় অবস্থা থেকে বাঁচাবার জন্য, আল্লাহ প্রদত্ত শ্রেষ্ঠ মর্যাদায় তাকে প্রতিষ্ঠিত করার বা প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য এই হেদায়েত আল্লাহ তায়ালা পাঠিয়েছেন যুগে যুগে তার কিছু প্রিয় বান্দার মাধ্যমে, ইসলামের ইতিহাসে যারা

নবী এবং রসূল নামে পরিচিত। আর উক্ত নবী-রসূলদের কাছে যে হেদায়েত এসেছে কিতাব বা সহিফা আকারে, নবী বা রসূলগণ আনীত সেই সব কিতাব বা সহিফাসমূহের উদ্দেশ্য ছিল মানুষের সমাজে আল্লাহ প্রদত্ত দীন বা বিধান প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শান্তি, কল্যাণ, ন্যায় ও ইনসাফ কায়েম করা। আল্লাহর ভাষায়–

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ- (الحديد:٢٥)

"আমরা যুগে যুগে নবী এবং রসূল পাঠিয়েছি এবং নাজিল করেছি কিতাব ও মীযান, মানুষের সমাজে ইনসাফ কায়েমের জন্য।" (হাদীদ : ২৫)

এ উদ্দেশ্যে মানুষের প্রতি প্রেরিত আল্লাহ তায়ালার সর্বশেষ নবী হলেন মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ সা. এবং সর্বশেষ কিতাব হলো আল-কোরআন। আল্লাহ তায়ালা বিভিন্ন যুগে নবী-রসূল ও কিতাব পাঠাবার যে উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেছেন সর্বশেষ নবী এবং সর্বশেষ কিতাব তা থেকে ব্যতিক্রম বা বিচ্ছিন্ন কিছু নয় বরং যেহেতু এরপর আর কোন নবী আসবে না, আর কোন কিতাবও আসবে না, সুতরাং মানুষের সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা, মুক্তি ও কল্যাণ তথা ন্যায়-ইনসাফ প্রতিষ্ঠার ব্যাপক হেদায়েত আল-কোরআনে থাকা আরো বেশি যুক্তিসঙ্গত। মহান আল্লাহর পবিত্র কিতাব সর্বশেষ গ্রন্থ আল-কোরআনের যথার্থ পরিচয় জানা আল্লাহর বান্দাদের পরিচিত করবার একটি ক্ষুদ্র প্রয়াস মাত্র। আল্লাহ আমাদের তাঁর কিতাবের যথার্থ পরিচয় জানার তৌফিক দিন, তৌফিক দিন উক্ত কিতাবের যথার্থ সমঝ বুঝ লাভ করে সে অনুযায়ী আমল করার।

সহজে উপলব্ধির জন্য আমরা বিষয়টিকে আটটি অংশে আলোচনা করব। প্রথম অংশে আল-কোরআনের কয়েকটি নামের অর্থ এবং তাৎপর্য। দ্বিতীয় অংশে কোরআনের আয়াতসমূহের শ্রেণী ও প্রকৃতি নিরূপণ এবং তৃতীয় অংশে কোরআনের আলোচ্য বিষয়সমূহের সংক্ষিপ্ত সার, চতুর্থ অংশে নজুলের প্রেক্ষিতে আয়াত সমূহের শ্রেণীবিন্যাস, পঞ্চম অংশে আল-কোরআনের ভাব ভাষা প্রসঙ্গ, ষষ্ঠ অংশে আল-কোরআন থেকে হেদায়েত লাভের উপায়, সপ্তম অংশে আল কোরআন বুঝার উপায়সমূহ, অষ্টম অংশে আল-কোরআন থেকে হেদায়েত পাবে কারা?

আল্লাহ আমাকে যথাসাধ্য সহজ-সরল ও সুস্পষ্টভাবে মনের ভাব প্রকাশের তৌফিক দিন-আমিন।

আল-কোরআনের কয়েকটি নামের অর্থ এবং তাৎপর্য

আমরা এই অধ্যায়ে আল-কোরআনের পাঁচটি নামের অর্থ এবং তাৎপর্য আলোচনা করব–

এক. আল-কোরআন : আল্লাহ তায়ালার সর্বশেষ কিতাব আল-কোরআন নামেই পরিচিত। এটাই এ কিতাবের মূল নাম। কোরআন "কারায়াত" থেকেই ফু'লানুনের ওজনে। এর অর্থ পড়া, পাঠ করা বা যা পড়া হয়, পাঠ করা হয়। আল-কোরআন এমন গ্রন্থ, এমন এক কিতাব যা অবশ্য অবশ্যই পাঠ করতে হবে, বার বার পাঠ করতে হবে। বেশি বেশি পাঠ করতে হবে বা করা উচিত। এর অর্থ এটাই করা যেতে পারে যে, কেবলমাত্র এই কিতাব পাঠ করেই মানুষ সাফল্যমণ্ডিত হতে পারে, নাযাত বা মুক্তি পেতে পারে। আল-কোরআনের পয়লা ওহি 'ইকরা' শব্দটিও দু'বার উল্লেখিত ও উচ্চারিত হওয়া তাৎপর্যবহ।

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ - خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ - اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ - الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ - عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ - (العلق : ٥)

"পড় তোমার রবের নামে। যিনি সৃষ্টি করেছেন, সৃষ্টি করেছেন জমাট রক্ত থেকে, পড় এবং তোমার রব বড়ই দয়ালু। যিনি কলমের মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন। মানুষ যা জানত না তাই তিনি তাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন।"

উক্ত আয়াত ক'টির আলোকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, আল্লাহর নামে পড়তে হবে। বার বার পড়তে হবে আল্লাহর কিতাব। কারণ যাবতীয় জ্ঞানের উৎস এটাই। মানুষের জ্ঞান গবেষণার কেন্দ্রবিন্দুই এই কোরআন। বাস্তবে "আল-কোরআনের" এই শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থের যথার্থতার প্রমাণ বিদ্যমান। 'কোরআন" এই শব্দটি বিশ্বকোষের গ্রন্থে 'The most read book of the world' নামেই পরিচিত, অভিহিত। শুধু পড়ার দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যায়-লাখ লাখ আল্লাহর বান্দা এ কোরআন মুখস্থ করেছে বা করেছে। এই মুখস্থ করতে গিয়ে কতবার যে পড়তে হচ্ছে তার কোন ইয়ত্তা নেই। কোরআনই একমাত্র গ্রন্থ যা বার বার পড়লেও বিরক্তি আসে না। বরং যত বেশি পড়া যায় তত বেশি মজা পাওয়া যায়।

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ (الحجر : ٩)

"আমি এ কোরআন নাযিল করেছি, আমিই এর হেফাজত করব।" (হিজর : ৯)

এই খোদায়ী উক্তি সম্ভবত খোদার ইশারায় এভাবে কার্যকর হচ্ছে। জ্ঞান গবেষণার দৃষ্টিতে বিচার করলেও দেখা যাবে সেই কোরআন নাজিলের মুহূর্ত থেকে এ পর্যন্ত প্রতিযুগে প্রতি শতাব্দীতেই কোরআনের ওপর জ্ঞান গবেষণা চলে আসছে, এখনও সেই গবেষণার কাজ অব্যাহত গতিতে চলছে, একই ধারায় এটা চলতে থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত।

এভাবে মানুষের সমাজে শান্তি ও কল্যাণ, ন্যায় ইনসাফ কায়েম করতে হলে সমস্যাসংকুল পৃথিবীর মানুষকে সমস্যা মুক্ত করতে হলে, দিশেহারা মানবগোষ্ঠীকে পথের সন্ধান দিতে হলে, মানুষের জন্য যে বাস্তব জ্ঞানের অনুশীলন প্রয়োজন তা হতে হবে কেবল কোরআনকে অবলম্বন করেই।

দুই. আল-ফোরকান : আল্লাহর সর্বশেষ কিতাবের দ্বিতীয় যে নামটি প্রধান নামের পাশাপাশি পরিচিত তা হল আল-ফোরকান। এ নামে একটি সূরারও নামকরণ করা হয়েছে। কোরআন সম্পর্কে বলা হয়েছে :

الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ (البقرة: ١٨٥)

"এতে মানুষের জন্য চলার পথের নির্দেশিকা রয়েছে আরো রয়েছে সঠিক পথ নির্দেশিকার দলিল-প্রমাণ এবং ফোরকান" ফোরকান পার্থক্যকারী। কিসের পার্থক্যকারী? ফোরকান শব্দের স্বীকৃত অর্থ হল "হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণকারী।" এই একই অর্থে কোরআনকে চূড়ান্ত, সুস্পষ্ট ও অকাট্য বক্তব্য নামে অভিহিত করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে মানুষের জন্য কিসে মঙ্গল আর কিসে অমঙ্গল নিহিত রয়েছে, মানুষের জন্য কোনটা বাস্তব সত্য আর কোনটা মিথ্যা, মানুষের জন্য কোনটা সুন্দর আর কোনটা অসুন্দর, কিসে মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয় আর কিসে সাফল্যমন্ডিত হয়, মানবতার মুক্তি, শান্তি ও কল্যাণ কিসে আছে আর কিসে নাই এ সম্পর্কে কোরআনের বক্তব্যই চূড়ান্ত সত্য। কোরআনের সিদ্ধান্তই শিরোধার্য ও অবধারিত। এভাবে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে, প্রতিটি দিক ও বিভাগে গ্রহণ ও বর্জনের ক্ষেত্রে কোরআন আমাদের প্রকৃত মাপকাঠি। কোরআনের আলোকে প্রমাণিত হককে গ্রহণ এবং বাতিলকে বর্জন করাই এ কিতাবের প্রকৃত দাবি।

তিন. আল-হুদা : আল্লাহ তায়ালা তার কিতাবের পরিচয় দিতে যে শব্দটি বেশি বেশি প্রয়োগ করেছেন সেটা হলো "আল-হুদা"। কোরআন সম্পর্কে সূরা বাকারার শুরুতেই বলা হয়েছে।

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَارَيْبَ ۛ فِيْهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ (البقرة : ٢)

"এই কোরআন আল্লাহর কিতাব এতে কোন সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ নেই এটা মুত্তাকীদের জন্য পথের দিশারী ।" (বাকারা : ২)

هُوَ الَّذِىْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ (الفتح : ٢٨)

"আল্লাহ সেই মহান সত্তা যিনি তাঁর রাসূল পাঠিয়েছেন হুদা এবং দীনে হক সহকারে ।"(ফাতহ ২৮)

هٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَّمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ (العمران : ١٣٨)

এই কিতাবে সব মানুষের জন্য ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়ের বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে আর পথ নির্দেশ ও নসিহত রয়েছে মুত্তাকীদের জন্যে ।" (আল ইমরান : ২)

''আল-হুদা' এই আরবি শব্দটির অর্থ পথের দিশা বা দিকনির্দেশিকা ।" কোরআন মানুষের জীবন পথের দিশারী । মানুষের ব্যক্তি জীবন, পারিবারিক জীবন, সমাজ জীবন, অর্থনৈতিক জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন, আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক জীবন পরিচালিত হবে কোরআন থেকে পথের দিশা নিয়ে, দিকনির্দেশিকা নিয়ে । এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য হল এই কোরআনকে মানুষ দৈনন্দিন জীবনের চলার পথের অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করবে । আল্লাহর কিতাব কোরআন "আল-হুদা" । এই অর্থ মানুষের সামগ্রিক জীবনের জন্যে এটাই একমাত্র সত্য ও কল্যাণকর নীল-নকশা । এই নীল-নকশার ভিত্তিতে দীনে হক বা দীন ইসলাম প্রতিষ্ঠা করেছেন নবী মুহাম্মদ সা. । সুতরাং আল-কোরআনের নীল-নকশার আলোকে জীবনকে গড়তে হলে কোরআনকে পড়তে হবে, বুঝতে হবে মুহাম্মদ সা. এর তেইশ বছরের সংগ্রামী জীবনের বাস্তব শিক্ষার আলোকে ।

কোরআন শুধু হুদা নয়, "আল-হুদা" । অর্থাৎ একমাত্র সঠিক পথ-নির্দেশ । জীবনের কোন একটি বা দুটি দিক বা বিভাগের জন্য নয় মানব জীবনের গোটা দিক ও বিভাগের সার্বিক বিধান ও সামগ্রিক পথ-নির্দেশ । কোরআন পথের দিশারী জীবিত মানুষের জন্য । জীতিব অবস্থায় কোরআনের পথ-নির্দেশ অনুসরণ করে যারা আখেরাতের জিন্দেগীতে মুক্তি ও নাজাতের ব্যাপারে সচেষ্ট, কোরআন কেবল তাদের জন্যেই ওছিলা বা অবলম্বন হিসেবে ভূমিকা পালন করে থাকে । দুনিয়ার বেঁচে থাকতে যারা কোরআনকে জানল না, মানল না, কোরআনের পথ-নির্দেশের পরোয়া করল না, কোরআনও তাদেরকে কিছু দিতে পারে না । তারাও কোরআন থেকে কোন কিছু পাওয়ার আশা করতে পারে না ।

চার. আজ-জিক্র: কোরআনকে আল্লাহ তায়ালা জিকর নামে অভিহিত করে বলেন–

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (الحجر :٩)

"। তোমার উপর 'আজ-জিক্র অর্থাৎ কোরআন নাজিল করেছি। আর আমরা অবশ্যই এর হেফাজত করবো।" (হিজর : ৯)

কোরআনকে যেমন আজ-জিক্র নামে অভিহিত করা হয়েছে, তেমনি কোরআনকে জিকিরের জন্যে সহজ করার কথাও আল্লাহ্ তায়ালা ব্যক্ত করেছেন। আল্লাহ্ বলেন–

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ (القمر : ١٧)

"আমরা কোরআনকে হেদায়েত লাভ বা নসিহত লাভের জন্যে সহজ করেছি। আছে কি কোন নছিহত গ্রহণকারী?" (আল-কামার : ১৭)

এই জিক্র শব্দটির অর্থ মনে মনে স্মরণ করা, ভুলে যাওয়া জিনিস স্মরণ হওয়া, স্মরণ করা বা করানো। আবার বর্ণনা করার অর্থেও হয়। কোরআন জিক্র অর্থাৎ স্মারক। কিসের স্মারক? মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়ার স্মারক। মানুষকে তার ভুলে যাওয়া আত্ম-পরিচয় ও মর্যাদার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়ার স্মারক। প্রকৃতপক্ষে মানুষ এই দুনিয়ায় কেন এসেছে, কোথা থেকে এসেছে, কোথায় যাবে, কী তার জীবনের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য, কোনটা তার আসল ঠিকানা, কী হবে তার পরিণাম-পরিণতি, ইত্যাদি যাবতীয় ব্যাপারে মানুষকে অবগত ও ওয়াকেফহাল করে যে গ্রন্থ, তার নাম আল-কোরআন। এই অর্থেই তার আর এক নাম আজ-জিক্র। মানুষের প্রকৃত পরিচয় জানার আর কোন মাধ্যম নেই এই কোরআন ছাড়া, মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা জানার আর কোন নির্ভরযোগ্য সূত্র নেই কোরআন ছাড়া, মানুষের আসল ঠিকানা এবং শেষ পরিণাম ও পরিণতি সম্পর্কে জানার আর কোন সুযোগ নেই এই কোরআন ছাড়া, মানুষের স্রষ্টা আল্লাহর পরিচয়, তাঁর সাথে মানুষের সঠিক সম্পর্ক, তিনি কিসে সন্তুষ্ট হন আর কিসে অসন্তুষ্ট হন, তাও জানার একমাত্র উপায় এই কোরআন। তাই কোরআন শুধু জিক্র নয়। আজ-জিক্র।

পাঁচ. কিতাবুম মুবিন : আল্লাহ তায়ালা তার কোরআনকে কিতাব, আল কিতাব, কিতাবুম মুবিন ও আল কিতাবুল মুবিন প্রভৃতি নামেও অভিহিত করেছেন। আল কিতাবুল মুবিনটা বেশি তাৎপর্যবহ। আরবি ভাষায় কিতাব অর্থ কেবল বই পুস্তকই নয়। চিঠি পত্রকেও বুঝানো হয়ে থাকে। সুতরাং কিতাবের অর্থ যদি চিঠি

হয় তাহলে আল কিতাবুল মুবিন এর অর্থ দাঁড়ায় বিশেষ একটি খোলা চিঠি। যে খোলা চিঠি এসেছে স্রষ্টার পক্ষ থেকে তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষের প্রতি। সাধারণত কারো প্রতি কোন খোলা চিঠি দেয়া অর্থ তার কাছে কিছু দাবি দাওয়া আছে। এই দাবি-দাওয়া যথাসময়ে যথাবিহিত পূরণ না করলে ফলাফল খারাপ হতে পারে, এমন পরোক্ষ নয় বরং প্রত্যক্ষ হুমকিও থাকে।

আল্লাহ আমাদের রব, আমরা তাঁর খলিফা, তিনি আমাদের মুনিব, আমরা তাঁর দাস বা গোলাম। আল্লাহ তাঁর দাস, গোলাম বা খলিফার দায়িত্ব-কর্তব্য এবং করণীয় কাজের বর্ণনা দিয়ে কোরআন রূপে এই খোলা চিঠি পাঠিয়েছেন আমাদের প্রতি। যাতে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করলে তাকে বা তাদেরকে পুরস্কৃত করবার ঘোষণা আছে, তেমনি এ দায়িত্ব ও কর্তব্য অবহেলা করলে দুনিয়ার লাঞ্ছনা-গঞ্জনা এবং আখেরাতে কঠিন ও ভয়াবহ শাস্তির হুমকি রয়েছে অত্যন্ত কঠোর ও স্পষ্ট ভাষায়। আল্লাহ তায়ালার কোরআন রূপ এই খোলা চিঠি দাবি করে, এর কোথায় আল্লাহ তাঁর বান্দার কাছে কি দাবি করেছেন, তার কাছে কি চেয়েছেন, নিষ্ঠার সাথে তা জানতে এবং বুঝতে চেষ্টা করা এবং এর অন্তর্নিহিত দাবি পূরণে আপ্রাণ চেষ্টা সাধনা করা। তারা সত্যিই হতভাগা এবং নির্বোধ যারা আল্লাহকে মানে বলে দাবি করে, তাঁর কিতাবের প্রতি অগাধ ভক্তি শ্রদ্ধাও পোষণ করে অথচ জানতে বুঝতে চেষ্টা করে না তাদের মহান মালিক এতে কি বলেছেন, কি চেয়েছেন।

কোরআনের আয়াতসমূহের প্রকৃতিগত শ্রেণীবিন্যাস

আল-কোরআনের একমাত্র নির্ভরযোগ্য ও অনুসরণীয় শিক্ষক নবী সা. যিনি (জীবন্ত কোরআনও বটে) আল কোরআনের আয়াতসমূহকে প্রকৃতিগত দিক থেকে পাঁচটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন এবং কোনটার কি দাবি তাও বলে দিয়েছেন। কোরআন পাঠকালে, কোরআন নিয়ে জ্ঞানগবেষণা-কালে এই শ্রেণীবিন্যাসকে সামনে রাখলে যথেষ্ট ফায়দা পাওয়া যেতে পারে।

কোরআনের আয়াতসমূহ পাঁচ রকমে নাজিল করা হয়েছে। হালাল, হারাম, মুহকাম, মুতাশাবেহ ও আমসাল। সুতরাং হালালকে হালাল জানবে, হারামকে হারাম জানবে, মুহকাম অর্থাৎ কোরআনে বর্ণিত আকিদা, বিশ্বাস ও আইন-কানুন অনুযায়ী আমল করবে। আর মুতাশাবেহ অর্থাৎ যেসব আয়াতে কিয়ামত আখেরাতের বর্ণনা এসেছে, বেহেশত, দোজখ, আরশ, কুরসী প্রভৃতির বর্ণনা

এসেছে, সেগুলোর প্রতি ঈমান আনবে- এ নিয়ে বাক-বিতণ্ডায় যাবে না। এবং আমসাল অর্থাৎ বিভিন্ন জাতির ধ্বংসের দৃষ্টান্তমূলক বর্ণনা থেকে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে।

হালাল : আল্লাহ্ তায়ালা আমাদের জন্যে যেসব কাজকে বৈধ করেছেন, যে সমস্ত সামগ্রী গ্রহণযোগ্য বলে ঘোষণা করেছেন বা যেসব জিনিস নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেননি, সেই সবই এই পর্যায়ে পড়ে।

এগুলো সম্পর্কে আল্লাহর ঘোষণা- مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ 'তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূল যা কিছু নিয়ে এসেছেন তা গ্রহণ কর।' আল্লাহ্ আমাদের জন্য যা কিছু হালাল বা বৈধ করেছেন তা দ্বিধাহীন চিত্তে গ্রহণ করতে হবে। বিশেষ কারণবশত আল্লাহর রাসূল সা. মধু না খাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। আল্লাহ্ সে সম্পর্কে জানিয়ে দিলেন, আল্লাহ্ যা হালাল করেছেন তা কেন হারাম করে নিচ্ছ? এক ধরনের দরবেশগণ সৌন্দর্যকে হারাম মনে করে নোংরা সাজে চলাফেরা পছন্দ করে, তাদের এ বাড়াবাড়িকে অন্যায় সাব্যস্ত করে আল্লাহ ঘোষণা করেন- قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ 'বল, হে মুহাম্মদ আল্লাহর সৃষ্টি করা সৌন্দর্যকে কে হারাম করল?'

হারাম : হালালের পাশাপাশি হারাম বা আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের জন্য কিছু জিনিসকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। আল্লাহর রাসূল বলেছেন, কুরআন পাঠের দাবি হল, মানুষ ঐ সব নিষিদ্ধ জিনিস বর্জন করে চলবে, আল্লাহ্ নিজেও তাই বলেছেন, وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا 'আল্লাহর পক্ষ থেকে আল্লাহর রাসূল যে জিনিস গ্রহণ করতে বারণ করেন তোমরা সেগুলো থেকে বিরত থাকবে।'

মুহকাম : প্রকৃতপক্ষে মুতাশাবেহ আয়াতগুলো বাদে আল-কোরআনের সবগুলি আয়াতই মুহকামের পর্যায়ে পড়ে। আল-কোরআন এগুলিকেই কিতাবের মূল বিষয়বস্তু বা উম্মুল কিতাব নামে আখ্যায়িত করেছে। হালাল-হারামের আলোচনার পাশাপাশি ঈমান আকিদা তথা তৌহিদ ও রেসালাতের বিষয়গুলো উপস্থাপন করতে গিয়ে আল্লাহ্ তায়ালা আফাক ও আনফুস বা সৃষ্টিলোক থেকে এবং মানুষের জীবন থেকে যেসব উদাহরণ ও যুক্তি পেশ করেছেন তা অতি সহজ ও অতিশয় মজবুত এবং সুস্পষ্ট। এ সবই মুহকামের অন্তর্ভুক্ত।

মুতাশাবেহা : এমন সব আয়াতকে বলা হয় যেগুলোর মর্ম উপলব্ধি করা মানুষের পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়। আল্লাহর জাতকে মানুষ কিভাবে আয়ত্তে আনবে। বেহেশ্‌ত, দোজখ, আরশ-কুরসীর রহস্য মানুষ বস্তুজগতের আয়নায় কিভাবে

বুঝতে সক্ষম হবে? তাই কোরআন স্বয়ং এগুলোর ব্যাপারে মাথা ঘামাতে বারণ করে। নবী সা.ও এ জাতীয় আয়াতগুলোর প্রতি দ্বিধাহীন চিত্তে ঈমান আনতে বলেছেন। কোরআন তো বলেছে যাদের মন বাঁকা তারাই এগুলো নিয়ে কূটতর্কে লিপ্ত হয়ে অহেতুক বিভ্রান্তি ছড়ায়। যারা প্রকৃত জ্ঞানী তারা এসবের প্রতি পূর্ণ আস্থা পোষণ করে। এ জাতীয় আয়াতসমূহ নিয়ে বেশি মাথা ঘামানো ঠিক হবে না। এই কথার অর্থ এ নয় যে, এগুলো সব অবাস্তব ও অযৌক্তিক। প্রকৃতপক্ষে এ সব উর্ধ্ব জাগতিক বিষয় সম্পর্কে এই জগতের কোন কিছুর সাথে তুলনা করে বুঝতে চেষ্টা করাটাই একটা বোকামি। মন যাদের বাঁকা তারা এই বোকামিটাই করে থাকে।

وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ (البقرة : ٢٥٥)

"আল্লাহর কুরসী আসমান ও জমীন পরিব্যাপ্ত করে আছে।" এখানে কুরসী বলতে ক্ষমতা-প্রতিপত্তি, কর্তৃক-সার্বভৌমত্ব বুঝলে ব্যাপারটা সহজ হয়ে আসে। আমরা মেনে নিতে পারি আসমান-জমীন তথা সৃষ্টিলোকের সর্বত্র আল্লাহর কর্তৃত্ব-সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত বা কার্যকর। কিন্তু কোন বাঁকা মনের মানুষ কুরসীকে যদি চেয়ার মনে করে প্রশ্ন করা শুরু করে, এতবড় চেয়ার কোথায় আছে, কিভাবে আছে তার পায়াগুলো কোনটা কোথায় কিভাবে ঝুলছে বা লেগে আছে, তাহলে সে কেবল মাথাই খারাপ করতে পারবে, পরিস্থিতি ঘোলাটেই করতে পারবে, কোরআন থেকে হেদায়েত লাভ করতে পারবে না।

অনুরূপ আল্লাহর একজন বান্দার জন্য যে বেহেশ্‌তের ওয়াদা রয়েছে তার এক একটির পরিধি গোটা আসমান জমিনের চেয়েও বেশি। সুতরাং কোটি কোটি মানুষের জন্য কোটি কোটি বেহেশতের ব্যবস্থা কোথায় আল্লাহ কিভাবে করে রেখেছেন, বস্তুজগতের চৌহদ্দীর মধ্যে অবস্থান করে তা কিভাবে আয়ত্তে আনা বা উপলব্ধি করা সম্ভব? সুতরাং এক্ষেত্রে দুনিয়া জাহানের স্রষ্টা মহান মালিক যা বলেছেন আমাদের মগজে কুলাক আর নাই কুলাক তা সত্য ও অবধারিত এবং এর প্রতি বিশ্বাস ও আস্থা অবশ্যই পোষণ করতে হবে। এটাই আল্লাহর প্রতি ঈমানের যথার্থ দাবি। মূলত এমন আয়াতের সংখ্যা খুব বেশি নয়, উপরন্তু এগুলো পুরোপুরি বুঝতে পারা না পারায়ও কিছু যায় আসে না। এখানে কেবল বিশ্বাসই কাম্য।

আমসাল : "আমসাল" অর্থাৎ কোরআনে বর্ণিত ঐতিহাসিক দৃষ্টান্তবলী। মহাগ্রন্থ আল-কোরআনে আল্লাহ্‌ তায়ালা মানুষকে একমাত্র তাঁরই ইবাদত করার এবং তাঁর রসূলকে সা. জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করার আহ্বান

জানিয়েছেন । এর যথার্থ গুরুত্ব বুঝাবার জন্যে এটাকে না জানার, অস্বীকার করার পরিণাম পরিণতি সম্পর্কে ওয়াকেফহাল করার জন্য আল্লাহ তায়ালা অনেক ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন। এই সব ঐতিহাসিক ঘটনা ও দৃষ্টান্ত থেকে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে যুগ-যুগান্তের ইতিহাস থেকে, যেসব আচরণের কারণে কওমে নুহকে আল্লাহ তায়ালা ধ্বংস করেছেন। যে কারণে আল্লাহ তায়ালা কওমে লুৎ, কওমে আদ ও কওমে ছামুদকে ধ্বংস করেছেন। যেরূপ খোদাদ্রোহী আচরণের কারণে নমরুদ, ফেরাউন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ভোগ করেছে। কোরআনে উল্লেখ করার উদ্দেশ্য আমরা যেন ঐ সব আচরণ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে বাঁচার চেষ্টা করি। অন্যথায় অনুরূপ পরিণাম পরিণতির সম্মুখীন আমরাও হতে পারি।

ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত ছাড়াও আল্লাহ তায়ালা তৌহিদ ও আখেরাতের মর্ম উপলব্ধি করানোর জন্য, দুনিয়ার জীবন ও আখেরাতের জীবনের মধ্যেকার পার্থক্য বুঝাবার জন্যেও বেশ কিছু উপমা ও উদাহরণ পেশ করেছেন। যেমন দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী ও ক্ষণভঙ্গুর রূপটা বুঝাবার জন্যে মাকড়সার জালের সাথে তুলনা করেছেন। এগুলো থেকেও আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে।

যারা কোরআন পড়েন, তেলাওয়াত করেন, তাদের সামনে প্রত্যহ এই পাঁচ প্রকারের কোন না কোন এক প্রকারের আয়াত অবশ্যই এসে থাকে। তারা যদি কোরআন পাঠের মুহূর্তে উল্লেখিত হাদিসটি সামনে রাখেন তাহলে অবশ্যই যথার্থ ফায়দা হাসেল করতে সক্ষম হবেন।

আল-কোরআনের কেন্দ্রীয় বক্তব্য বিষয়

একশত চৌদ্দটি সূরা এবং ছয় হাজার ছয় শ' ছেষট্টিটি আয়াত বিশিষ্ট এই কোরআনে অসংখ্য বিষয়ের আলোচনা এসেছে। অবশ্য মানব রচিত গ্রন্থের ন্যায় বিষয় সূচিসহ বিভিন্ন স্বতন্ত্র অধ্যায় উপ-অধ্যায় ভিত্তিক আলোচনা এখানে স্থান পায়নি। এটাও আল্লাহর কিতাবের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য, একটি অনবদ্য দিক। অসংখ্য অগণিত বিষয়ের অবতারণার মাধ্যমে যে বিষয়টি সবই বলতে গেলে প্রতি পাতায় পাতায়, প্রতি আয়াতে এমনকি প্রতিটি শব্দে শব্দে বিবৃত হয়েছে তা হলো মানুষের কল্যাণ ও অকল্যাণের কথা। আর এই মূল বিষয়টির সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত হয়েছে তিনটি বিষয়–

এক. আল্লাহর যথার্থ পরিচয়।

দুই. আল্লাহর সাথে বান্দার সঠিক সম্পর্ক এবং

তিন. মানুষের কল্যাণের জন্য আল্লাহ্ প্রদত্ত সঠিক পথ।

সূরাতুল ফাতেহা, উম্মুল কোরআন বা কোরআনের মুখবন্ধ আল্লাহর শিখানো পদ্ধতিতে সঠিক পথের কামনা তাতেও আমরা এই তিনটি বিষয়ের সন্ধান পাই। প্রথম তিন আয়াতে আল্লাহর পরিচয়, চতুর্থ আয়াতে আল্লাহ্র সাথে সঠিক সম্পর্কের বর্ণনা, শেষ তিন আয়াতে মানুষের চির-কল্যাণ শান্তি ও মুক্তির পথ সীরাতে মুস্তাকিমের আলোচনা। গোটা কোরআনের প্রতি পাতায় পাতায় ছত্রে ছত্রে এই তিনটির কোন না কোন একটার সন্ধান অবশ্যই পাওয়া যাবে।

এই কেন্দ্রীয় বিষয় এবং বিস্তারিত বিষয় সূচির মধ্যবর্তী একটা অধ্যায়ও আমরা আমাদের আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করতে পারি। আর সে অধ্যায়কে আমরা 'আল-কোরআনের মৌলিক বিষয়সমূহ' এই নামেও অভিহিত করতে পারি। যার এক একটার অধীনে অগণিত বিষয়ের সন্নিবেশ ও সমাবেশ হতে পারে। এই মৌলিক বিষয়সমূহ পাঁচটি (এক) ঈমানিয়াত (দুই) মৌলিক ইবাদত (তিন) আখলাকিয়াত (চার) নিজামে হায়াত/জীবন ব্যবস্থা) (পাঁচ) জিহাদ, ন্যায় বা সত্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম।

ঈমানিয়াত

এই কোরআন মানুষের সমাজে শান্তি, কল্যাণ ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রথমে কতকগুলো বিষয়ের প্রতি যথার্থ অর্থে আস্থা ও বিশ্বাস পোষণের দাবি জানিয়েছে। ইসলামী শরীয়াতের পরিভাষায় তাকে ঈমান বলা হয়ে থাকে। বস্তুত যারা উক্ত মৌলিক বিষয়সমূহের প্রতি ঈমান বা বিশ্বাসের ঘোষণা দেয়, কোরআনের যাবতীয় হুকুম-আহকাম, যাবতীয় অনুশাসন, আদেশ-নিষেধ তাদের জন্যই। যারা এই মৌলিক বিষয়সমূহের প্রতি ঘোষণা দেয়নি, তাদের মানুষ হিসাবে সম্বোধন করে কোরআন বারবার আহবান জানিয়েছে বিশ্বাস পোষণের এবং আল্লাহর দাসত্ব কবুল করার। আর যারা এই বিশ্বাসের ঘোষণা দিয়েছে তাদেরকে "হে ঈমানদার লোকেরা!" বলে সম্বোধন করে বিভিন্ন আদেশ-নিষেধের কথা জানানো হয়েছে। উক্ত মৌলিক বিষয়গুলো পাঁচটি: যথা (১) আল্লাহ (২) আখেরাত (৩) ফেরেশতা (৪) কিতাব ও (৫) নবী-রসূলগণ। কোরআন বলে–

آمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ، كُلٌّ آمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهِ
وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهِ (البقرة:٢٨٥)

"রাসূল এবং তাঁর সাথের ঈমানদার লোকেরা আল্লাহর নাজিলকৃত হেদায়েতের প্রতি ঈমান এনেছে, তারা ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি, ফেরেশতাদের প্রতি, কিতাবসমূহের প্রতি, নবী-রসূলগণের প্রতি, (তাদের ঘোষণা) কোন নবী ও রসূলদের মধ্যে আমরা কোন প্রকারের পার্থক্য বা তারতম্য সৃষ্টি করি না।" (বাকারা : ২৮৫)

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ (البقرة : ١٧٧)

"নেককাজ কেবলমাত্র পূর্বে ও পশ্চিমে মুখ ফিরানো নয় বরং সত্যিকারের নেককার তারা যারা আল্লাহ, আখেরাত, ফেরেশতা, কিতাব ও নবীদের প্রতি ঈমান আনে।" (বাকারা- ১৭৭)

কেবলমাত্র বিশ্বাসের আহ্বান জানিয়েই কোরআন শেষ করেনি, এই ঈমানের ঘোষণা যারা দেয় তাদের যথার্থ পরিচয়ও তুলে ধরেছে। যার আলোকে আমরা ঈমানের দাবি এবং তাৎপর্যও উপলব্ধি করতে পারি। বলা হয়েছে–

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا (الحجرات : ١٥)

"মুমিন তো প্রকৃতপক্ষে সেই ব্যক্তি যে আল্লাহ এবং রসূলের প্রতি ঈমান আনে। অত:পর আর কোন সন্দেহ সংশয় পোষণ করে না।" (হুজুরাত : ১৫)

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا . (حم السجدة : ٣٠)

"যারা ঘোষণা করেছে 'আল্লাহ আমাদের রব' অত:পর এই ঘোষণার উপর আমল করেছে দৃঢ় অবিচলভাবে।" (হা-মীম সিজদা : ৩০)

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ . (الانفال : ٢)

"মুমিন তো প্রকৃতপক্ষে তারাই, আল্লাহর কথা উচ্চারিত হলে যারা ভীত কম্পিত হয়ে উঠে।" (আনফাল : ২)

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ . (البقرة : ١٦٥)

"যারা ঈমান এনেছে তারা আল্লাহকে সর্বাধিক ভালবাসে।" (বাকারা: ১৬৫)

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (النساء : ٦٥)

"কক্ষনো নয় হে নবী! তোমার রবের শপথ তারা কখনও ঈমানদার বলে পরিগণিত হবে না যদি তাদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-কলহের ক্ষেত্রে তোমাকে বিচারক মেনে না নেয়। অত:পর তুমি যা কিছু ফয়সালা করে দিবে তা গ্রহণ করতে মনে কোন দ্বিধা-সংকোচ থাকবে না বরং মাথা পেতে নেবে।" (নিসা : ৬৫)

إِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ، يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ (التوبة : ١١١)

"আল্লাহ মুমিনদের জান এবং মাল খরিদ করে নিয়েছেন বেহেশ্‌তের বিনিময়ে- তারা লড়াই করবে আল্লাহর পথে অত:পর (ঐ পথেই) মারবে এবং মরবে।" (তাওবা : ১১১)

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ - تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ، ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ (الصف : ١٠-١١)

"হে ঈমানদার লোকেরা! তোমাদের কি এমন একটি ব্যবসায়ের কথা বলে দেব না যে ব্যবসা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে রক্ষা করবে? ঈমান আনো আল্লাহ এবং রসূলের প্রতি আর সংগ্রাম কর আল্লাহর পথে মাল দিয়ে ও জান দিয়ে। এটাই তোমাদের জন্যে উত্তম যদি তোমরা প্রকৃত সত্য জানতে পার।" (সফ : ১০-১১)

اِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذَا دُعُوْا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اَنْ يَّقُوْلُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا . (النور : ٥١)

"মুমিনকে যখন আল্লাহ ও রসূলের দিকে ডাকা হয় তাদের পরস্পরের মধ্যকার কোন ব্যাপারে ফয়সালা দেবার জন্যে, তখন তারা উত্তরে এছাড়া আর কিছুই বলে না আমরা শুনলাম আর মেনে নিলাম।" (নূর : ৫১)

অনুরূপভাবে অগণিত আয়াত রয়েছে যাতে ঈমানের অর্থ ও গুরুত্ব এবং ঈমানদার ব্যক্তিদের যথার্থ পরিচয় দেয়া হয়েছে। এসব আয়াতের বর্ণনা এতই স্পষ্ট যে, কোন প্রকারের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের তেমন প্রয়োজন হয় না। আল-কোরআনে ঈমানের আলোচনা সর্বাধিক গুরুত্ব এবং প্রাধান্য পেয়েছে। কারণ আল-কোরআনের গোটা শিক্ষা, গোটা হেদায়াত ও অনুশাসনের কার্যকারিতা এর

উপরই নির্ভরশীল। তাই আমরা যারা কোরআনের পাঠক তাদেরকে সার্থকভাবে কোরআনকে আঁকড়ে ধরার জন্য, কোরআন থেকে হেদায়াত লাভের এই পূর্ব শর্ত পূরণ করতে হবে অর্থাৎ কোরআনের বর্ণনার আলোকে আল্লাহ, আখেরাত, ফেরেশতা, কিতাব ও রিসালাতের প্রতি যথার্থ অর্থে ঈমান আনতে হবে।

মৌলিক ইবাদতসমূহ

কোরআন মানুষের সামগ্রিক জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগকেই আল্লাহর গোলামী ও দাসত্বের ভিত্তিতে গড়ে তুলতে চায়। এজন্য কোরআনের অনুসারীদের সামনে সার্বক্ষণিক ইবাদতের একটা সার্বিক ব্যবস্থাই তুলে ধরা হয়েছে। এই সার্বক্ষণিক ইবাদতের যোগ্যতা অর্জনের লক্ষ্যে বাস্তব প্রশিক্ষণ লাভের জন্যে কোরআন কিছু আনুষ্ঠানিক এবং মৌলিক ইবাদতের নির্দেশ ও বিধান দিয়েছে যেমন, (১) সালাত (২) যাকাত (৩) রোজা এবং (৪) হজ্জ। রোজা এবং হজ্জের নির্দেশ সংক্রান্ত আয়াতসমূহ অবশ্য বার বার উল্লেখ হয়নি। কিন্তু সালাত কায়েম কর আর যাকাত আদায় কর এ মর্মে প্রচুর আয়াতের উল্লেখ পাওয়া যায়। মৌলিক ইবাদতের ক্ষেত্রে লক্ষণীয়-আল্লাহর নবী এসব মৌলিক ইবাদতসমূহ পালনের বাস্তব দীক্ষা দিয়েছেন। কিন্তু এর বাইরের কোন প্রক্রিয়াকে ইবাদত হিসাবে তিনি নিজেও চাপিয়ে যাননি। এ থেকে আমরা একটা সূক্ষ্ম বিষয় উপলব্ধি করতে পারি। তা হলো ইবাদতের ক্ষেত্রে সার্বক্ষণিক ইবাদতের প্রস্তুতির লক্ষ্যেই হোক আর আল্লাহর নৈকট্য লাভের লক্ষ্যেই হোক আল-কোরআনে বর্ণিত ঐ চারটি প্রক্রিয়ার বাইরে আমরা যেতে পারি না। যাবার অনুমতি নেই। আল্লাহর নৈকট্য লাভের সার্বক্ষণিক ইবাদতের প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য উল্লিখিত চারটি প্রক্রিয়াই নির্ভুল প্রক্রিয়া এবং নির্ভুল ইবাদত।

আমরা ফরজ, ওয়াজিব ও সুন্নাত নামাজের উপরে নফল নামাজ অসংখ্য আদায় করতে পারি, ফরজ যাকাতের পরিবর্তে আল্লাহর ওয়াস্তে আল্লাহর গরিব বান্দাদের জন্য যত ইচ্ছা খরচ করতে পারি। ফরজ রোজার পর আমরা নফল রোজাও বেশি রাখতে পারি। হজ্জের নিয়মে হজ্জের মৌসুম ছাড়া ওমরা করতে পারি কিন্তু এগুলোর বাইরে নিজদের বা অন্য কোন মানুষের মনগড়া প্রক্রিয়া অনুযায়ী আল্লাহর নৈকট্য লাভের চেষ্টা করতে পারি না। অন্য কারো কাছে ধর্না দেয়া সালাতের বিকল্প হতে পারে না। কোথাও কারো নামে শিন্নি দেয়া যাকাত বা আল্লাহর ওয়াস্তে ছদকার বিকল্প হতে পারে না। অন্য রকমের রেয়াজ ও আত্মসংযমের জন্য রোজার বিকল্প হতে পারে না। অনরূপভাবে অন্য কোন দেশ

ভ্রমন,ওরশে যোগদান, কোন ইজতেমায় যোগদান হজ্জের বিকল্প হতে পারে না। আল্লাহর নৈকট্য লাভের একমাত্র নির্ভুল প্রক্রিয়া আল্লাহ প্রদত্ত এবং রাসূল সা. প্রদর্শিত প্রক্রিয়ার। কোরআনে বর্ণিত ইবাদতসমূহের আয়াতগুলো আলোচনার মাধ্যমে আমাদেরকে এই সিদ্ধান্তে অবশ্যই উপনীত হতে হবে। ইবাদত সংক্রান্ত আয়াতসমূহের সার কথা প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় হলো :

وَمَا أُمِرُوْا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ . (البينة : ٥)

"তাদের প্রতি কেবল এই নির্দেশই দেয়া হয়েছে যে, তারা যেন আল্লাহর জন্য দীনকে খালেছ করে নিয়ে একমাত্র তাঁরই বন্দেগী করে।" (আল বাইয়্যেনা : ৫)

আখলাকিয়াত

কোরআন মানুষকে সর্বোত্তম আখলাক শিক্ষা দিয়েছে। আল্লাহ যার মাধ্যমে আমাদেরকে কোরআন দিয়েছেন তিনি সর্বোত্তম আখলাকের মূর্ত প্রতীক ছিলেন। কোরআনের ঘোষণা 'তুমি সর্বোৎকৃষ্ট চরিত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত।' উত্তম চরিত্রের শ্রেষ্ঠ নমুনা ওসওয়ায়ে হাসানার অধিকারী নবী মুহাম্মদ সা. এর সাথীদের মধ্যে কোরআনের আলোকে এবং নবীর বাস্তব প্রশিক্ষণের ফলে বিকশিত হয়েছে অতুলনীয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। আমরাও কোরআন পাঠ ও তার বাস্তবায়নের মাধ্যমে অনুরূপ চরিত্রের অধিকারী হতে পারি। এই উত্তম চরিত্রের বর্ণনা আল-কোরআনের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নভাবে স্থান পেয়েছে। আমরা কেবল উপলব্ধির উদ্দেশ্যে দু'একটি অংশের উল্লেখ করছি। রহমানের খাঁটি বান্দা তারাই যারা মাটির এ পৃথিবীতে বিনয়ের সাথে চলাফেরা করে। মূর্খ লোকেরা বিব্রত করতে চাইলে তারা কৌশলে শান্তিপূর্ণ উপায়ে পাশ কাটিয়ে যায়। যারা তাদের রবের দরবারে দাঁড়িয়ে এবং সেজদায় রাত কাটায়। যারা এই বলে দোয়া করে :

وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا - إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا . (الفرقان : ٦٥-٦٦)

"হে আমাদের রব, জাহান্নামের আজাব থেকে আমাদেরকে রক্ষা করো, সেই আজাব তো হলো জানের কাল। আর সেই জাহান্নাম তো অত্যন্ত নিকৃষ্টতম বাসস্থান।" (ফুরকান : ৬৫-৬৬)

وَالَّذِيْنَ إِذَآ أَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا - وَالَّذِيْنَ لَا
يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ إِلٰهًا اٰخَرَ وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ إِلَّا بِالْحَقِّ
وَلَا يَزْنُوْنَ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا - يُّضٰعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ
الْقِيٰمَةِ وَيَخْلُدْ فِيْهٖ مُهَانًا - إِلَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولٰٓئِكَ
يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِهِمْ حَسَنٰتٍ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا - وَالَّذِيْنَ لَا يَشْهَدُوْنَ
الزُّوْرَ ۙ وَإِذَا مَرُّوْا بِاللَّغْوِ مَرُّوْا كِرَامًا وَالَّذِيْنَ إِذَا ذُكِّرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوْا
عَلَيْهَا صُمًّا وَّعُمْيَانًا (الفرقان: ٦٧-٧٣)

"তারা অর্থ ব্যয়ের সময় অপচয় করে না। আবার কৃপণতাও করে না। বরং এ দুয়ের মাঝে ভারসাম্য রক্ষা করে। তারা আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে মাবুদ হিসাবে ডাকে না। অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করে না। ব্যভিচারে লিপ্ত হয় না। যারা এসব কাজ করবে তাদেরকে এর শাস্তি অবশ্যই ভোগ করতে হবে। কিয়ামতের দিন তাদেরকে উপর্যুপরি শাস্তি দেয়া হবে। আর সে শাস্তির মাঝেই তাদেরকে চিরস্থায়ীভাবে নিমজ্জিত থাকতে হবে। কিন্তু যারা তওবা করবে এবং পুনরায় ঈমান এনে আমলে ছালেহ করতে শুরু করবে এমন লোকদের খারাপ কাজকে আল্লাহ তায়ালা ভাল কাজ দ্বারা পরিবর্তিত করে দেবেন। আল্লাহ মেহেরবান এবং ক্ষমাশীল। তওবার পর যারা নেক আমলের প্রয়াস পায় তারাই সত্যিকার অর্থে তওবা করে থাকে।

"রহমানের বান্দার আরো পরিচয় তারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না। কোন বেহুদা ব্যাপার সামনে এলে তারা ভদ্রোচিতভাবে তা এড়িয়ে যায়। তাদেরকে যদি আল্লাহর কোন আয়াত শুনিয়ে নছিহত করা হয় তাহলে সেক্ষেত্রে তারা অন্ধ অথবা বধিরের ন্যায় আচরণ করে না।" (ফুরকান : ৬৭-৭৩)

وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا
لِلْمُتَّقِيْنَ إِمَامًا (الفرقان: ٧٤)

“হে আমাদের রব আমাদের বিবি ও সন্তানদেরকে চক্ষু শীতলকারী বানাও আর আমাদেরকে খোদাভীরু লোকদের অগ্রণী বানাও।” (ফুরকান : ৭৪)

الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ، وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ (ال عمران : ١٣٤)

“যারা সচ্ছল অসচ্ছল সর্বাবস্থায় আল্লাহর পথে মাল খরচ করে যারা ক্রোধকে নিয়ন্ত্রণ করে অন্যদের অপরাধ ক্ষমা করে। মুহসেন বা নেক লোকদেরকে আল্লাহ ভালবাসেন।” (আলে-ইমরান : ১৩৪)

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ- الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ- وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ (المؤمنون : ١-٣)

“ঐসব ঈমানদার লোকেরা অবশ্যই সফলকাম হয়েছে। যারা নামাজে বিনয়ী হয়ে থাকে। বেহুদা কার্যক্রম থেকে দূরে থাকে।” (মুমিনূন : ১-৩)

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحًا ، اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ (لقمان : ١٨)

“লোকদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে কথা বলো না, এ পৃথিবীতে গর্ব অহংকারের প্রকাশ ঘটিয়ে চলাফেরা করো না। আল্লাহ আত্মম্ভরী ও অংহকারী ব্যক্তিদের পছন্দ করেন না।” (লোকমান : ১৮)

নিজামে হায়াত বা জীবন ব্যবস্থা

মানুষের জীবনের বিভিন্ন দিক বা বিভাগের জন্যে আল্লাহর মনোনীত নিয়ম-নীতি ও পদ্ধতি সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে কোরআনে। পিতা-মাতা ছেলেমেয়েদের প্রতি কি কি দায়িত্ব পালন করবে, ছেলেমেয়েরা মা-বাপের প্রতি কি আচরণ করবে, নারী-পুরুষের মধ্যে কোন নিয়মে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হবে, স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কি কি দায়িত্ব থাকবে, স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কি কি দায়িত্ব থাকবে, ব্যবসা-বাণিজ্য, রুজী-রোজগার কিভাবে করবে, বিচার ফয়সালা তথা শাসন সংবিধান কিভাবে চলবে– বলতে গেলে ঈমানের পর এটাই কোরআনের

গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর আইন মানতে হবে এবং সে আইন-বিধি কি এ জন্যই তো কোরআন। ঈমান ছাড়া সে বিধান মানা যায় না। আবার এ বিধান না মেনে ঈমানদারও থাকা যায় না। মাঝখানের আনুষ্ঠানিক ইবাদত এবং উত্তম আখলাক তো এই সার্বক্ষণিক ইবাদতের জন্যে জীবনের সর্বস্তরে ও সর্বক্ষেত্রে দীন মেনে চলার ও প্রতিষ্ঠা করার জন্যই। এই পর্যায়ে আয়াতগুলো পরিমাণে এত ব্যাপক এবং বিভিন্নমুখী হবার কারণে এই ক্ষুদ্র নিবন্ধে বিস্তারিত উদাহরণ দেয়া সম্ভব নয়। সংক্ষেপে জীবন ব্যবস্থার মৌলিক নির্দেশনা সূচক কতিপয় আয়াত উল্লেখ করা হল।

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرٰىكَ اللّٰهُ ، وَلَا تَكُنْ لِّلْخَائِنِيْنَ خَصِيْمًا (النساء :١٠٥)

"হে নবী! আমরা এ কিতাব তোমার প্রতি বাস্তব সত্যসহ নাজিল করেছি। যাতে করে আল্লাহ তোমাকে যে পথ দেখিয়েছে সে অনুসারে তুমি মানুষের মাঝে বিচার ফয়সালা করতে পার। আর তুমি যেন খেয়ানতকারীদের পক্ষে বিতর্ককারী না হও।" (নিসা : ১০৫)

وَاَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَهُمْ . (المائدة : ٤٩)

"অতএব হে মুহাম্মদ (দ.)! এই সব লোকদের মাঝে আল্লাহর নাজিল করা আইন অনুযায়ী বিচার ফয়সালা করো, তাদের নফসের খেয়াল খুশির অনুসরণ করো না।" (মায়েদা : ৪৯ এর অংশ বিশেষ)

إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰنٰتِ إِلٰٓى أَهْلِهَا ، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ، إِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ ، إِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا

(النساء: ٥٨)

"আল্লাহ তোমাদেরকে এই মর্মে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা যাবতীয় আমানত যথোপযুক্ত ব্যক্তিদের নিকট সোপর্দ কর। আর মানুষের মাঝে যখন কোন বিচার ফয়সালা করবে তখন তা পরিপূর্ণ ইনসাফের সাথেই করবে। আল্লাহ তোমাকে কতই না সুন্দর উপদেশ দান করছেন, আল্লাহ অবশ্যই সব সময় সবকিছু শুনেন ও দেখেন।" (নিসা : ৫৮)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ
الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا
الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا
(النساء: ١٣٥)

"হে ঈমানদারগণ তোমরা ইনসাফের ধারক-বাহক হয়ে যাও। আর সাক্ষ্যদাতা হয়ে যাও আল্লাহর জন্য। সেই ইনসাফ ও সাক্ষ্যের আঘাত তোমাদের নিজদের বা মা-বাবা বা নিকট আত্মীয়ের উপরই পড়ুক না কেন, আর পক্ষদ্বয় ধনী-গরীব যাই হোক না কেন, তাদের সবার তুলনায় আল্লাহর অধিকারই বেশি, তোমরা তার দিকেই লক্ষ্য রাখবে, অতএব প্রবৃত্তির অনুসরণ করতে গিয়ে ন্যায়বিচার থেকে বিরত থেকো না। তোমরা যদি মন গড়া কথা বলো, অথবা সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও তাহলে জেনে রাখবে, আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় কাজ কারবার সম্পর্কে অবহিত আছেন।" (নিসা : ১৩৫)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي
عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا
أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ
مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ
أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا
تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ
وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ
جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفْعَلُوا
فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (البقرة: ٢٨٢)

"হে ঈমানদারগণ, যদি কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তোমরা পরস্পর ঋণ লেনদেন কর, তবে তা অবশ্যই লিখে নেবে। একজন উভয় পক্ষের প্রতি সুবিচারসহ দলিল লিখে দেবে। আল্লাহ পাক এরূপ লেখার যোগ্যতা দিয়েছেন সে যেন লিখতে অস্বীকার না করে। যে ব্যক্তি লিখবে আর যার উপর ঋণের দায়িত্ব অর্পিত হচ্ছে সে উক্ত বিষয়টি লিখিয়ে নেবার ব্যবস্থা করবে। সে যেন তার প্রভু আল্লাহকে ভয় করে, আর যেসব কথাবার্তা ঠিক করা হয়েছে তাকে কোন কম-বেশি না করে। কিন্তু যদি ঋণ গ্রহীতা অজ্ঞ, নির্বোধ কিংবা দুর্বল হয় এবং উক্ত দলিল লিখিয়ে নিতে সক্ষম না হয়, তাহলে তার অভিভাবক ইনসাফসহ লিখিয়ে নিবে। অতঃপর দুইজন পুরুষকে এর সাক্ষ্য বানিয়ে নাও। যদি দুইজন পুরুষ পাওয়া না যায়, তাহলে একজন পুরুষ ও দু'জন স্ত্রীলোক সাক্ষী হবে। যেন একজন ভুলে গেলে অপরজন তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। এই সাক্ষী এমন লোকদের মধ্য থেকে হওয়া উচিত যাদের সাক্ষ্য তোমাদের নিকট গ্রহণযোগ্য। যখন কাউকে সাক্ষী হতে বলা হবে তখন তারা যেন সাক্ষ্য হতে অস্বীকার না করে। ব্যাপার ছোট হোক আর বড় হোক 'মেয়াদ' নির্ধারণ করে তার লিখিত দলিল তৈরি করাকে উপেক্ষা করো না। আল্লাহর নিকট এই পদ্ধতি অধিকতর সুবিচারমূলক। এর মাধ্যমে সাক্ষী প্রমাণ হাজির করা খুবই সহজ হয়ে থাকে। এবং তোমাদের সন্দেহ সংশয়ে লিপ্ত হবার আশংকা থাকে না বললেই চলে। অবশ্য যেসব ব্যবসায়ীকে লেন-দেন তোমরা নগদা নগদী বা হাতে হাতেই করে থাক, তা না লেখায় কোন দোষ নাই। কিন্তু ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপার ঠিক করার সময় অবশ্যই সাক্ষী রাখার ব্যবস্থা করবে। লেখক ও সাক্ষীকে যেন কষ্ট দেয়া না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। এরূপ করলে তা অবশ্যই অন্যায় হবে। আল্লাহর গযব থেকে বাঁচার চেষ্টা কর। তিনি তোমাদেরকে সঠিক কর্মনীতি শিক্ষা দিচ্ছেন। আল্লাহ অবশ্য অবশ্যই সবকিছু জানেন।" (বাকারা : ২৮২)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (النحل: ٩٠)

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা ইনসাফ ও ইহসান করতে এবং নিকট আত্মীয়দেরকে অর্থ দান করতে আদেশ দিয়েছেন। আর ফাহেশায় মুনকার এবং জুলুম ও সীমা লংঘনমূলক কাজ করতে নিষেধ করেছেন। (নাহল : ৯০)

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ- وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ- وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (الانعام: ١٥١-١٥٣)

"হে মুহাম্মদ সা. এইসব লোকদেরকে লক্ষ্য করে বলে দাও তোমরা আস। আমি তোমাদেরকে শুনাই তোমাদের মুনীব তোমাদের উপর কি কি বিধি -নিষেধ আরোপ করেছেন। তা হলো, তোমরা তার মাঝে কাউকে শরীক করবে না।" পিতা-মাতার সাথে ভাল ব্যবহার করবে। নিজেদের সন্তানদেরকে দারিদ্রের ভয়ে হত্যা করো না। আমি তোমাদেরকেও রিজিক দেই এবং তাদেরকেও রিজিক দেই। অশ্লীলতা এবং বেহায়াপনার কাছেও যাবে না। তা প্রকাশ্যই হোক আর গোপনীয়ই হোক না কেন। সত্য ও ন্যায়বিচারের দাবি ছাড়া কারো প্রাণনাশ করবে না যাকে আল্লাহ নিষিদ্ধ করেছেন। এই সব ব্যাপারে তিনি তোমাদেরকে এজন্যই নির্দেশ দিয়েছেন যে তোমরা বুঝে-শুনে কাজ করবে।

তোমরা ইয়াতিমদের মালের ধারে কাছেও যাবে না, উত্তম নিয়ম ও পন্থা ছাড়া। সেই নিয়মের অধীন ততদিন তাদের মাল দেখাশুনা করতে পারবে যতদিন না তারা জ্ঞানবুদ্ধির বয়সে পৌঁছায়। আর মাপে ও ওজনে পরিপূর্ণ রূপে ইনসাফ করবে। আমরা সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা কারও উপর চাপাই না। আর যখন কথা বলবে, ইনসাফের কথা বলবে, তা নিজের নিকট আত্মীয়ের ব্যাপারেই হোকনা কেন। আর আল্লাহর সাথে করা ওয়াদা অবশ্যই পূরণ করবে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে এজন্য নির্দেশ দিয়েছেন যেন তোমরা তোমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা স্মরণ করতে পার।

আর মনে রেখ এটাই আমার দেয়া সরল-সহজ ও সঠিক পথ। অতএব তোমরা এই পথই অনুসরণ কর। এই পথ বাদ দিয়ে অন্য কোন পথেই চলবে না। যদি চল, তাহলে সেই সব পথ তোমাদেরকে আল্লাহর পথ থেকে সরিয়ে নিয়ে তোমাদের ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে ফেলবে। এই মর্মে আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যাতে করে তেমরা বিপথগামী হওয়া থেকে নিজদেরকে বাঁচাতে সক্ষম হও।" (আনয়াম : ১৫১-১৫৩)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ - إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُّوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ
وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۚ فَهَلْ أَنْتُمْ
مُّنْتَهُونَ. (المائدة: ٩٠-٩١)

'হে ঈমানদারগণ, মদ, জুয়া ও পাশা এ সবই নাপাক শয়তানী কাজ। অতএব তোমরা এ সব পরিহার কর। আশা করা যায় যে, তোমরা সফল হবে।

শয়তান এই মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে চায়। আরো চায় আল্লাহর জিকির এবং সালাত থেকে বিরত রাখতে। এখন তোমরা কি এ সব থেকে বিরত থাকবে?" (মায়েদ : ৯০-৯১)

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ. (المائدة: ٣٨)

"চোর পুরুষ হোক বা নারী উভয়েরই হাত কেটে দাও। এটা তাদের কর্মফল এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে অপমানজনক ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি। আল্লাহ সর্বজয়ী ও মহাজ্ঞানী।" (মায়েদা : ৩৮)

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ
فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ
الْمُؤْمِنِينَ. (النور: ٢)

"ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী প্রত্যেককে একশতটি করে কোড়া মার। আল্লাহর আইন প্রয়োগের মুহূর্তে তোমাদের মনে যেন কোন দুর্বলতা সৃষ্টি না হয়, যদি তোমরা আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান এনে থাক। আর এহেন শাস্তিদান যেন একদল মুমিনের উপস্থিতিতে সংঘটিত হয়। (নূর : ২)

وَأَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا . (البقرة : ٢٧٥)

আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল বানিয়েছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন। (বাকারা : ২৭৫ এর অংশ বিশেষ)

এভাবে আমাদের বাস্তব ও ব্যবহারিক জীবনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগ সম্পর্কে আল-কুরআনের সুস্পষ্ট হেদায়াত রয়েছে তা কেবল তেলাওয়াতের জন্য নয়। বরং বাস্তবে কার্যকর করার জন্যই আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন।

আল্লাহর পথে জিহাদ

আল-কোরআনে ঈমানিয়াত, ইবাদত, আখলাকিয়াত ও নিজামে হায়াত বা জীবন ব্যবস্থা সংক্রান্ত যেসব বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়েছে তা নিছক তাত্ত্বিক আলোচনার জন্য উপস্থাপিত হয়নি। বরং মানুষের ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের সর্বত্র এটাকে বাস্তবে রূপ দেয়ার তাগিদ রয়েছে এতে। মানুষের জীবনে এবং আল্লাহর জমিনে এর প্রতিটি শিক্ষা কার্যকর হোক, বাস্তবায়ন হোক, অন্য কথায় আল্লাহর দীন মানুষের জীবনের সর্বক্ষেত্রে সমস্ত দিক ও বিভাগে বিজয়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হোক এটাই আল্লাহর একান্ত ইচ্ছা। আল্লাহ কোরআন নাজিল করেছেন এবং রাসূল সা.-কে পাঠিয়েছেন এই মহান উদ্দেশ্যেই। আল-কোরআনের ঘোষণা :

هُوَ الَّذِىٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ . (الفتح : ٢٨)

"আল্লাহ সেই মহান সত্তা যিনি রাসূল পাঠিয়েছেন 'আল-হুদা' এবং দীনে হক" সহকারে-একে অন্যান্য দীনের উপর পরিপূর্ণরূপে বিজয়ী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য।" (ফাতাহ : ২৮)

আল্লাহর দীনের বিজয়ের লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্যই আল-কোরআনে জিহাদের নির্দেশ বিবৃত হয়েছে। জিহাদের এই নির্দেশও আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সা. প্রতি ঈমানের অনিবার্য দাবিস্বরূপই এসেছে। বলা হয়েছে–

وَجَاهِدُوْا فِى اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ ؕ هُوَ اجْتَبٰىكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ . (الحج : ٧٨)

"আল্লাহর পথে যথাযথভাবে সংগ্রাম কর। তিনি তোমাদেরকে তাঁর দীনের কাজের জন্য মনোনীত করেছেন। দীনের মধ্যে তোমাদের জন্য কোন প্রকারের সংকীর্ণতা ও জটিলতার অবকাশ রাখেন নি।" (হজ্ব : ৭৮)

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ - تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ . (الصف: ١٠-١١)

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদেরকে কি এমন একটা উপায় বলে দিব যা তোমাদেরকে কঠিন শাস্তি থেকে নাজাত দিবে? তোমরা সঠিক অর্থে ঈমান আন আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের প্রতি এবং সংগ্রাম কর আল্লাহর পথে মাল দিয়ে, জান দিয়ে। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম মনে হবে যদি তোমরা সঠিক জ্ঞান লাভে সক্ষম হও।" (সূরা সফ : ১০-১১)

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ . (التوبة: ١١١)

"আল্লাহ মুমিনদের জান এবং মাল খরিদ করে নিয়েছেন বেহেশতের বিনিময়ে- তারা লড়াই করবে আল্লাহর পথে অতঃপর (ঐ পথেই) মারবে এবং মরবে।" (তাওবা: ১১১)

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ، وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ . (التوبة: ٧٣)

"হে নবী! কাফের এবং মুনাফিকদের পূর্ণ শক্তি দিয়ে মুকাবিল করো। তাদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করো। তাদের সর্বশেষ ঠিকানা হলো জাহান্নাম যা অতি নিকৃষ্টতম বাসস্থান।" (তাওবা: ৭৩)

জিহাদ অর্থ যুদ্ধ নয়। চূড়ান্ত প্রচেষ্টা, প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা। সর্বাত্মক প্রচেষ্টাই জিহাদের সত্যিকারের শাব্দিক অর্থ। আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূল সা. প্রদর্শিত আদর্শ মানুষের জীবনের সমস্ত দিক ও বিভাগে চালু করার, জারি করার সার্বিক ও যথার্থ প্রচেষ্টাই জিহাদের পারিভাষিক অর্থ। এ কাজের সূচনা হয় কালেমা তাইয়্যেবার যথার্থ দাওয়াতের মাধ্যমে। যথার্থ দাওয়াত বলতে বুঝায় **প্রথমত** : যুগপৎভাবে গায়রুল্লাহর ইলাহিয়াত বা সার্বভৌমত্ব, কর্তৃত্ব ও প্রভুত্ব প্রভৃতিকে অস্বীকার করে বিশ্ব জাহানের স্রষ্টা আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও প্রভুত্ব গ্রহণের আহবান জানানো।
দ্বিতীয়ত : আল্লাহর নাফরমান বান্দাদের নেতৃত্ব কর্তৃত্ব বর্জন করে, প্রত্যাখ্যান করে নবীর নেতৃত্ব কবুল করা। এ ক্ষেত্রে দায়ী (আহবানকারী) নিজের পক্ষ থেকে

কিছু কম-বেশি করার অধিকার রাখে না। পরিস্থিতি পরিবেশ যাই হোক না কেন, দাওয়াত পেশ করার ক্ষেত্রে এই মৌলিক বক্তব্যে কোন রদবদল করলে সেটাকে ইসলামের দাওয়াত বলা যেতে পারে না।

وَاتْلُ مَآ أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ ۚ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهٖ (الكهف: ٢٧)

"আল্লাহর কিতাব আকারে যে অহি তোমার প্রতি নাজিল করা হয়েছে তা হুবহু পেশ করে দাও। আল্লাহর কিতাবে রদবদল করার অধিকার কারও নেই।" (কাহাফ : ২৭)

ইসলামের এই মূল আহবান যেহেতু খোদাহীন সভ্যতা, রীতি-নীতি, বিধি-বিধানের আমূল পরিবর্তন দাবি করে, দাবি করে সমাজ কাঠামোর উপরতলা থেকে নিয়ে নীচতলা পর্যন্তকার অসৎ ও খোদাদ্রোহী নেতৃত্বের অবসান। কাজেই কায়েমী স্বার্থের সাথে সংঘাত-সংঘর্ষের সূত্রপাত হয় একান্ত স্বাভাবিকভাবেই। দাওয়াতের যথার্থ হক আদায় করলে এ অবস্থা অবশ্যই সৃষ্টি হতে বাধ্য। দাওয়াত দাতাকেও কেবল মৌখিকভাবে এই ঘোষণা দিয়েই ক্ষান্ত হওয়া চলবে না। এ ঘোষণার যথার্থ বাস্তবায়নের জন্য অর্থাৎ গায়রুল্লাহর বিধানের সার্বিক পরিবর্তন ঘটিয়ে আল্লাহর বিধান কায়েম করা এবং আল্লাহদ্রোহী নেতৃত্বের অপসারণ করে আল্লাহভীরু লোকদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য ধাপে ধাপে অগ্রসর হতে হবে। যথার্থ প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। এভাবে সত্যিকার অর্থে ইসলামের দাওয়াত বাতিল শক্তির সাথে চূড়ান্ত লড়াই পর্যন্ত নিয়ে যায় এই সবটার নামই জিহাদ। জিহাদ সংক্রান্ত আমাদের সংক্ষিপ্ত আলোচনার সারকথা হলো- আল-কোরআনের সামগ্রিক শিক্ষার বাস্তবায়নের জন্য, অন্য কথায় আল্লাহর দীনের বিজয়ের জন্য মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) প্রদর্শিত পন্থায় চূড়ান্ত প্রাণান্ত প্রচেষ্টা চালানোকেই জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ বলা হয়।

আমরা আল-কোরআনের কেন্দ্রীয় বক্তব্য, বিষয় ও মৌলিক আলোচ্য বিষয়-সমূহ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনার মাধ্যমে যে ব্যাপক দিক ও বিভাগসমূহের ইশারা ইংগিত পেলাম, আল-কোরআনের প্রতি ঈমান আনার অর্থ এই সবগুলোকে গ্রহণ করা, এর কিছু মানা এবং কিছু না মানার কোন সুযোগ নেই। আল-কোরআনের সুস্পষ্ট ঘোষণা-

أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَآءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُرَدُّونَ إِلٰٓى أَشَدِّ الْعَذَابِ ۗ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (البقرة: ٨٥)

"তোমরা কি কোরআনের কিছু অংশ মানবে আর কিছু অংশকে করবে অস্বীকার? (এমনটি হবার নয়) যারা এমন করবে তাদের জন্য দুনিয়ায় রয়েছে লাঞ্ছনা-গঞ্জনা এবং আখিরাতে ভোগ করতে হবে কঠিন ভয়াবহ শাস্তি।" (বাকারা : ৮৫)
প্রকৃতপক্ষে কোরআনের প্রতি মুসলমানদের অনুরূপ আচরণই তাদের বর্তমান সময়ের দুর্দশা দুর্গতির জন্য দায়ী। আল্লাহ ভাল জানেন, দুর্দশার এখানেই শেষ নয়-আখিরাতের সে কঠিন শাস্তি কত ভয়াবহ হবে। ইয়া আল্লাহ্ আমাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতের এই দুর্দশার কবল থেকে রক্ষা করো।

নজুলের দৃষ্টিতে আল-কোরআনের আয়াতসমূহের শ্রেণীবিন্যাস

এই কোরআন যা আজ আমাদের কোটি কোটি মানুষের ঘরে ঘরে সংরক্ষিত। একে এভাবে গ্রন্থ আকারে আল্লাহ তায়ালা একদিনে নাজিল করেননি। বরং অংশ অংশ করে ২৩ বছর ধরে এ কোরআন নাজিল হয়েছে। সর্বশক্তিমান আল্লাহ ইচ্ছা করলে সব মানুষের ঘরে ঘরেই একাধিক কপি কোরআন পাঠাতে পারতেন। কিন্তু তিনি এমনটি করেননি। এমনকি এক খন্ড কিতাবের একটা অংশও একবারে নাজিল করেননি। আল্লাহ তায়ালার এই কাজটি হিকমতহীন নয়, উদ্দেশ্যহীন নয়। আল-কোরআনের প্রতিটি শব্দ প্রতিটি বাক্যের যথার্থ প্রয়োগ বিধি শিখাবার জন্য তিনি রাসূলের মাধ্যমে এ কিতাব আমাদেরকে দিয়েছেন। মুহাম্মদ সা.-এর ২৩ বছরের সংগ্রামী জীবনের বিশেষ অবস্থা ও পরিস্থিতিকে সামনে রেখে আল কোরআনের বিশেষ বিশেষ অংশ নাজিল হওয়ায় প্রকৃতপক্ষে আল-কোরআনের প্রতিটি বক্তব্যের যথার্থ বাস্তবায়ন ও প্রয়োগ পদ্ধতি বুঝা সহজ-সাধ্য হয়েছে। এভাবে নজুলের দৃষ্টিতে আমরা কোরআনের আয়াতসমূহকে দুই ভাগে ভাগ করতে পারি। প্রথম ভাগ মক্কার ১৩ বছরের সময়ের মধ্যে নাজিলকৃত। আর দ্বিতীয় ভাগ মদিনায় হিজরতের পরবর্তী ১০ বছরে নাজিল হয়েছে। মক্কার ১৩ বছর প্রকৃতপক্ষে দাওয়াত এবং সংগ্রামের যুগ। সুতরাং এই সময়ের নাজিলকৃত আয়াতসমূহের মধ্যে মূল বক্তব্য বিষয় হিসেবে স্থান পেয়েছে তৌহিদ, রিসালাত ও আখিরাতের আলোচনা বা দীন ইসলামের বুনিয়াদী আক্বিদা বিশ্বাসের কথা। এই ১৩ বছরের মধ্যে কেবল মিরাজের বর্ণনাসহ নাজিলকৃত সূরা 'আল-আসরা' তেই ইসলামী সমাজ কাঠামোর Outline এবং সূরা আনয়ামে কিছু মৌলিক আহকামের বর্ণনা পাওয়া যায়, যা বিজয় যুগে পদার্পণের নিশ্চিত সম্ভাবনার কারণে ছিল একান্তই অপরিহার্য। বাকি সবগুলো সূরা বা আয়াতই কেবল মৌলিক আক্বিদা বিশ্বাসের আলোচনায় ভরপুর। আর তার মধ্যেও আখিরাতের আলোচনা সর্বাধিক প্রাধান্য পেয়েছে। ব্যক্তি গঠনের ও আত্মগঠনের জন্য যেগুলো ছিল একান্তই অপরিহার্য।

মক্কায় ১৩ বছরে নাজিলকৃত আয়াতসমূহের প্রকৃতি আলোচনা করলেও আমাদের সামনে পরিস্থিতি-জনিত কিছুটা পার্থক্য পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। মক্কার এই ১৩ বছরের প্রথম তিন বছর আল্লাহর নবী গোপনে মুষ্টিমেয় লোকের সামনেই তার রিসালাতের কথা ব্যক্ত করেছেন। একান্ত নিকটের লোকরাই এ সম্পর্কে জানার সুযোগ পেয়েছে। সুতরাং বিরোধিতার কোনো প্রকাশ তখনও ঘটেনি। চতুর্থ বছরে প্রকাশ্য দাওয়াত শুরু হবার সাথে সাথে মৃদু বিরোধিতা, সমালোচনা ও কানাঘুষা শুরু হয়। এ অবস্থা চলতে থাকে দু'বছর যাবত। এরপর ষষ্ঠ বছর থেকে বিরোধীদের সমালোচনা ধাপে ধাপে তীব্র আকার ধারণ করতে থাকে। জুলুম-নির্যাতনের তীব্রতা বাড়তে থাকে। এ অবস্থা চলে নবুয়তের দশম বছর পর্যন্ত। একাদশ বছর থেকে ত্রয়োদশ বছর পর্যন্ত এই তিন বছরে সে জুলুম নির্যাতন সীমা ছাড়িয়ে যায়। পরিশেষে হিজরতের নির্দেশ আসে। এই পর্যায়ক্রমিক ইতিহাসকে সামনে রেখে তৎসংশ্লিষ্ট আয়াতসমূহ আলোচনা করতে পারলে অধিক ফায়দা পাওয়া যাবে। হিজরতের পরবর্তী দশ বছরে যেসব আয়াত বা সূরা নাজিল হয়েছে সেগুলোর প্রতি লক্ষ্য করলে বুঝা যায় এই স্তরে এসে মুহাম্মদ সা. আদর্শ সমাজ পরিচালনার উপযুক্ত হেদায়েতের মুখাপেক্ষী হন। মুখাপেক্ষী হন এ আদর্শকে দুনিয়ার সর্বত্র ছড়িয়ে দেবার কর্ম কৌশলের এবং এ সমাজ বিপ্লবের সুফল বিনষ্টকারী শক্তি অর্থাৎ ভিতরের ও বাইরের শত্রুদের সার্থক মোকাবিলায়, মদিনার দশ বছরে যেসব আয়াত ও সূরা নাজিল হয়েছে তাতে ঐসব প্রয়োজনই পূরণ করা হয়েছে। মুহাম্মদ সা. দুনিয়ার মানুষকে শান্তি, মুক্তি ও কল্যাণের পথে চালাবার মানসে যে বিপ্লবী আন্দোলনের সূচনা করেন তা পূর্ণতা ও সফলতা লাভের পর আল্লাহর নির্দেশে হযরত জিব্রাইল আ. কোরআনের আয়াত ও সূরা সমূহকে যেভাবে সন্নিবেশ করার শিক্ষা দিয়েছেন, পরবর্তী পর্যায়ে কোরআনকে সেভাবেই সংকলিত করা হয়েছে এবং আজ পর্যন্ত তা একইভাবে সংরক্ষিত। সেই সাথে কোন অংশ কোন সময়ে নাজিলকৃত তাও মোটামুটি ঐতিহাসিক গুরুত্বসহকারে সংরক্ষিত।

যেসব বিশেষ অবস্থাকে সামনে রেখে আল্লাহ তায়ালা কোরআনের বিশেষ বিশেষ অংশ নাজিল করেছেন, ঐসব অবস্থার সৃষ্টি না হলেও তা নাজিল করতেন। কাজেই কোরআনকে কোন বিশেষ অবস্থার এবং পরিবেশ ও পরিস্থিতির সৃষ্ট কোন গ্রন্থ বলার অবকাশ নেই। কোরআনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের ব্যাপারে ঐসব বিশেষ অবস্থার মধ্যে সীমাবদ্ধ বা কুক্ষিগত করার প্রয়াস পাওয়া ঠিক হবে না। কোরআন সর্বকালের সর্বযুগের জন্যে রাব্বুল আলামীনের চিরন্তন ও শাশ্বত বাণী। তাকে সেই ভাবেই বুঝতে চেষ্টা করা কোরআনের পাঠকদের জন্য অপরিহার্য।

অবশ্য ঐসব বিশেষ বিশেষ পটভূমি আলোচনা কোরআনের বিভিন্ন অংশের বাস্তবায়ন ও প্রয়োগ পদ্ধতি সম্পর্কে ওয়াকেফহাল হতে আমাদেরকে সাহায্য করে থাকে। এক্ষেত্রেও পরিস্থিতি মুখ্য নয়– রাসূল সা. কোন আয়াতে কি অর্থ করলেন, কিভাবে তার বাস্তবায়ন করলেন সেটাই মুখ্য এবং সেটাই একমাত্র নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যার সূত্র বা অবলম্বন।

কোরআনের ভাষা সবটাই আল্লাহর

আল-কোরআন কোন মানুষের রচিত গ্রন্থ নয়। এমনকি ভাব আল্লাহর, ভাষা রাসূলের তাও নয়। এ কোরআন সরাসরি আল্লাহর কিতাব এর ভাব-ভাষা সবটাই আল্লাহর, আল্লাহ নিজে এ কিতাব তাঁর শেষ নবীর উপর নাজিল করেছেন এবং তিনিই এ কিতাবকে সকল প্রকারের বিকৃতির হাত থেকে রক্ষা করেছেন। দুনিয়া জাহান সৃষ্টির অনেক অনেক পূর্বেই 'লাওহে মাহফুজে' এর নকশা ছিল বিদ্যমান।

মুহাম্মদ সা.-এর দাওয়াতকে যারা প্রত্যাখ্যান করেছিল তারা কোরআনকে আল্লাহর কিতাব হিসেবে গ্রহণ করতে চায়নি। তারা একে মুহাম্মদ সা. এর নিজস্ব রচনা ও কার্য হিসেবে অভিহিত করার ব্যর্থ প্রয়াস চালিয়েছে। আল্লাহ তাদেরকে চ্যালেঞ্জ করেছেন। এর ভাব-ভাষা সবটাই আল্লাহর। তিনি এটা নাজিল করেছেন। মুহাম্মদ সা. কে তিনি কবিতা শিক্ষা দেননি। এটাকে রাসূলের রচিত কাব্য বলে যারা চালাবার চেষ্টা করেছেন তাদের উত্তর দেয়া হয়েছে সূরা "আশ শোয়ারার" মাধ্যমে এবং আরো বিভিন্ন স্থানে। বলা হয়েছে :

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ ۖ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ - فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۖ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ (البقرة: ٢٣-٢٤)

"এই কিতাব আল্লাহর নাজিলকৃত, এই ব্যাপারে যদি তোমাদের কোন সন্দেহ থেকেই থাকে তাহলে তোমরা অনুরূপ একটা সূরা তৈরি করে দেখাও। এজন্য তোমাদের সাহায্যকারী হিসেবে যাদেরকে পাও সাথে লও, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। আর তোমরা পার নাই এবং কক্ষণও পারবে না। তাহলে ভয় করো সেই আগুনকে যে আগুনের ইন্ধন হবে মানুষ এবং পাথর।" (বাকারা : ২৩-২৪)

আরো বলা হয়েছে–

وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلَافًا كَثِيْرًا (النساء: ٨٢)

"যদি এ কোরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে না হত তাহলে তারা এতে অসংখ্য মতভেদ ও পরস্পর বিরোধী বক্তব্য দেখতে পেত।" (সূরা নিসা : ৮২)

"যুক্তি, বিবেক-বুদ্ধি এবং কোরআনের হিকমতপূর্ণ বক্তব্য সাক্ষ্য দেয়– এটা কোন মানুষের রচনা হতে পারে না। কোরআন মুহাম্মদ সা.-এর নিজস্ব সৃষ্টি তো নয়ই বরং হিকমতপূর্ণ কোরআনই মুহাম্মদ সা.-এর নবুয়াতের প্রধানতম সাক্ষী। কোরআনের প্রতি ঈমান পোষণকারীর মনে এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহ সংশয়ের কোন অবকাশ নেই।

আল-কোরআন থেকে হেদায়েত লাভের সহজ উপায়

আল-কোরআনের পন্ডিত হওয়া আর এ থেকে হেদায়েত লাভ করা এক জিনিস নয়। একদিকে পান্ডিত্য অর্জন যেমন কঠিন কাজ তেমনি ব্যাপক জ্ঞান গবেষণা দাবি করে প্রাণান্তকর চেষ্টা সাধনার। কিন্তু এত চেষ্টা সাধনা করে পান্ডিত্য অর্জিত হওয়ার পরও কোরআনের মূল হেদায়েত লাভ করা সম্ভব নাও হতে পারে। এ দৃষ্টিতে পান্ডিত্য অর্জনের এই দুঃসাধ্য এবং কঠিন কাজটির চেয়েও হেদায়েত লাভ করা, হেদায়েত লাভে সক্ষম হওয়া কঠিনতর কাজ। পক্ষান্তরে একজন মানুষ পান্ডিত্য অর্জনের মতো অত কঠিন জ্ঞান গবেষণা ছাড়াও আল্লাহর সাহায্যে হেদায়েত লাভ করতে পারে। সেই দৃষ্টিতে হেদায়েত লাভ করাটা আবার পান্ডিত্য অর্জনের চেয়ে সহজ ব্যাপার হিসেবেও বিবেচিত হতে পারে।

আল্লাহ, রাসূল, আখিরাত ও কোরআন প্রভৃতির প্রতি যারা ঈমান পোষণ করে তাদের তো কোরআন থেকে হেদায়েতই একমাত্র কাম্য। তাই "আল-কোরআন পরিচিতি।" এ প্রসঙ্গে আলোচনার শেষ অধ্যায় কোরআন থেকে হেদায়েত লাভের সহজ উপায় প্রসঙ্গে সংক্ষিপ্ত এবং বাস্তবমুখী কতিপয় পরামর্শ রেখে আলোচনা সমাপ্ত করতে চাই।

এক : যথার্থ ভক্তি-শ্রদ্ধাসহ বিশুদ্ধভাবে কোরআন তেলাওয়াতের অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে এবং এভাবে তেলাওয়াতের মাধ্যমে আত্মিক তৃপ্তি ও প্রশান্তি লাভের মানসিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। এই মন নিয়ে আল্লাহর কাছে তার কিতাবের সঠিক মর্ম উপলব্ধির তৌফিক চাইতে হবে। মনে রাখতে হবে আল্লাহ কেবল কোরআন নাজিলই করেননি। কোরআনের যথার্থ তালিমও তিনিই দিয়েছেন। মেহেরবান আল্লাহ কোরআন শিক্ষা দিয়ে মানুষের প্রতি তার মেহেরবানীর পূর্ণ প্রকাশ ঘটিয়েছেন। কাজেই সেই মেহেরবান আল্লাহর কাছে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ করে সঠিক জ্ঞান, সঠিক হেদায়েত তার কাছেই চাইতে হবে।

দুই : আল-কোরআনের শব্দসমূহের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ সাধ্যমত আয়ত্ত করার চেষ্টা করতে হবে।

তিন : সঠিক তরজমা আয়ত্ত করার চেষ্টা নিতে হবে।

চার : আল-কোরআন বুঝে পড়বার জন্য যখন যে অংশ, সূরা বা আয়াত বাছাই করতে হবে তখন সেই অংশের সাথে কোন ঐতিহাসিক পটভূমি (শানে নুজুল) আছে কি না, অথবা কোন ঐতিহাসিক ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে কি না সেটা দেখতে হবে। তাছাড়া আগে পরের আয়াতসমূহের সাথে উক্ত অংশের কোন যোগসূত্র আছে কি না তাও দেখা উচিত। এভাবে আলোচ্য অংশের কেন্দ্রীয় বক্তব্য বিষয় সম্পর্কে সম্যক একটা ধারণা লাভ করা সহজ হয়ে আসে।

পাঁচঃ এরপর বিস্তারিত ব্যাখ্যা বুঝতে চেষ্টা করতে হবে। ব্যাখ্যা বুঝবার ক্ষেত্রে লক্ষণীয়– কখনও গুরুত্বপূর্ণ কিছু কিছু শব্দের বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রয়োজন হয়। কখনও এক একটা আয়াতের মধ্যে একাধিক বিষয় সন্নিবেশিত থাকার কারণে বিষয়ভিত্তিক আলাদা আলাদা ব্যাখ্যা উপলব্ধির প্রয়োজন পড়ে। আবার কখনো একাধিক আয়াতের মধ্যে একটা বিষয় এসে যাওয়ার কারণে কয়েকটি আয়াতকে একত্রে মিলিয়ে ব্যাখ্যা বুঝাবার প্রয়োজন হয়। আবার কখনও এক একটি আয়াত একটি বিষয় কেন্দ্রিক হবার কারণে এক একটি আয়াতের আলাদা আলাদ ব্যাখ্যা বুঝার প্রয়োজন হয়। পাঠককে তার আলোচ্য অংশের প্রতি গভীর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে গভীর মনোনিবেশ সহকারে এগুলো Sort out করতে হবে।

ব্যাখ্যা অনুধাবনের ক্ষেত্রে আলোচ্য অনুরূপ কথা আল-কোরআনের আর কোথাও কিভাবে এসেছে তাও মিলিয়ে বুঝবার চেষ্টা করতে হবে। সেই সাথে এ প্রসঙ্গে রাসূলে মকবুল সা.-এর কথা এবং কাজেরও অনুসন্ধান করতে হবে। এর সাথে নির্ভরযোগ্য তাফসির সমূহের সহযোগিতাও ফলপ্রসূ হতে পারে।

ছয় : এভাবে কোরআনের বিভিন্ন অংশের সমার্থবোধক আয়াতসমূহ, হাদিসে রাসূলের এবং নির্ভরযোগ্য তাফসিরসমূহের সাহায্যে বিস্তারিত আলোচনা উপলব্ধির ফসলের সংক্ষিপ্তসার পয়েন্ট ভিত্তিক সাজাতে হবে এবং এগুলোকে আলোচ্য অংশের শিক্ষণীয় দিক হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।

সাত : আলোচ্য অংশের শিক্ষা ও দাবির পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান সময়ের করণীয় নির্ধারণের চেষ্টা করতে হবে। আল্লাহ প্রদত্ত রাসূল সা. প্রদর্শিত জ্ঞানের আলোকে পাঠকের আলোচ্য অংশের উপর বর্তমানে কিভাবে আমল করা যায় বা কিভাবে এর বাস্তবায়ন সম্ভব এ ব্যাপারে চিন্তার দুয়ারে বার বার আঘাত হানতে হবে।

আট : সর্বশেষে পাঠকের আলোচ্য অংশের আলোকে তাকে আত্মবিশ্লেষণ ও আত্মপর্যালোচনা করতে হবে। উক্ত অংশের যা কিছু গ্রহণ করতে বলা হয়েছে

পাঠক তা গ্রহণ করতে পেরেছে কি? অথবা যা কিছু বর্জন করতে বলা হয়েছে তা কি বর্জন করতে সক্ষম হয়েছে? এভাবে আত্মপর্যালোচা যেমন ব্যক্তিগতভাবে হতে পারে। তেমনি সামাজিকভাবে, সামষ্টিকভাবেও হতে পারে। আল্লাহর এই কিতাবের নির্দেশসমূহের হুকুম-আহকামের শতকরা কতভাগ আমাদের সমাজে, জাতীয় জীবনে চালু আছে তার খতিয়ান নেয়াকেই আমি সামষ্টিক আত্মসমালোচনা বলতে চাচ্ছি। এ আত্মবিশ্লেষণ ও আত্মপর্যালোচনার লক্ষ্য হবে আমলের শপথ গ্রহণ। গ্রহণ বর্জনের ক্ষেত্রে আল-কোরআনের শিক্ষা বাস্তবায়নের যথার্থ সংগ্রামে আত্মনিয়োগই হবে এই পর্যালোচনার সাক্ষাৎ ফল। আল্লাহ আমাদেরকে তার পাক কালামের মাধ্যমে যথার্থ হেদায়েত লাভের তৌফিক দিন।

কোরআন বুঝার উপকরণসমূহ

আল-কোরআন আমাদের কল্যাণ, অকল্যাণ ন্যায়-অন্যায়, সত্য-মিথ্যা, সুন্দর অসুন্দরের সঠিক অবস্থান সম্পর্কে জানিয়ে দেয়। কোরআন থেকে এই সঠিক সন্ধান নিতে হলে একে বুঝা, বুঝতে চেষ্টা করা একান্তই অপরিহার্য হয়ে যায়। তাই আল্লাহ প্রদত্ত এই মহামূল্যবান গ্রন্থকে কিভাবে বুঝতে হবে, বুঝতে পারা যাবে তার উপায় উপকরণ সম্পর্কেও আমাদের জানা থাকা দরকার। আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে নিম্নলিখিত কতিপয় বিষয়কে কোরআন বুঝবার সহজ উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

এক : আল-কোরআনের ভাষায় পন্ডিত না হলেও অন্তত কোরআনে বর্ণিত শব্দগুলোর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ জানার মতো আরবি ভাষা আয়ত্ত করা উচিত। এ ক্ষেত্রে আরবি ভাষায় ব্যাকরণের মৌলিক জ্ঞান এবং কোরআনিক শব্দ ও বাক্যগুলোর যথার্থ মর্ম বুঝবার উপযোগী ভাষা জ্ঞান একান্তই অপরিহার্য।

দুই : আল-কোরআন বুঝবার জন্য শুধু আরবি ভাষার জ্ঞান যথেষ্ট নয়। যার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা এই পাক কিতাব পাঠিয়েছেন তাঁর সংগ্রামী জীবনের বিস্তারিত ইতিহাস জানাও অপরিহার্য। কোরআনের কোন অংশ কোন পরিস্থিতিতে নাজিল হয়েছে এবং মুহাম্মদ সা. তার ওপর নিজে কিভাবে আমল করেছেন এবং সাহাবায়ে কেরামকে কিভাবে আমলের শিক্ষা দিয়েছেন এ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান ব্যতীত একজন আরবি ভাষার মহাপন্ডিতের পক্ষেও কোরআনের যথার্থ মর্ম উপলব্ধি করা সত্যিকারের শিক্ষা ও হেদায়েতের সাথে পরিচিত হওয়া সম্ভব নয়। প্রকৃতপক্ষে কোরআন ইসলামী জীবন যাপনের একটা ব্লু প্রিন্ট। নবী

করীম সা. এই ব্লু প্রিন্ট অনুসারে আল্লাহর নির্দেশে সরাসরি আল্লাহর তত্ত্বাবধানে ইসলামী জীবন বিধান ও সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছেন। কাজেই রাসূলে খোদা সা.-ই আল-কোরআনের একমাত্র শিক্ষক। তার সংগ্রামী জীবন প্রকৃতপক্ষে জীবন্ত কোরআন।

তিন : মুহাম্মদ সা. কে একমাত্র আদর্শ শিক্ষক হিসেবে গ্রহণ করে, একমাত্র সত্যের মাপকাঠি হিসেবে গ্রহণ করে, সেই মাপকাঠি অনুযায়ী নিজেদের জীবন জিন্দেগী গড়ে তুলে যারা স্বর্ণযুগের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সেই সাহাবায়ে কেরামের যুগের ইতিহাস এবং তাদের পরবর্তী অর্থাৎ তাবেয়ী, তাবে-তাবেয়ীদের ইতিহাসও জানার প্রয়োজন রয়েছে। অর্থাৎ রসূলে খোদা যেই যুগসমূহকে উত্তম যুগ বলেছেন সেই যুগের জ্ঞান চর্চার ইতিহাসও জানা অপরিহার্য।

চার : মানব সভ্যতার উত্থান-পতনের সাধারণ ইতিহাসও কোরআন বুঝতে সাহায্য করে থাকে। মানুষের উত্থান-পতনের প্রকৃত কারণ কোরআন পাকই নির্ধারণ করেছে। ইতিহাসের জ্ঞান কোরআনের উপস্থাপিত কারণেরই সাক্ষ্য বহন করে থাকে। এর তাৎপর্য সার্থকভাবে উপলব্ধি করতে হলে বিভিন্ন সভ্যতার, বিভিন্ন জাতির উত্থান-পতনের ইতিহাসের গভীরে যেতে হবে। যত গভীরে যাওয়া যাবে আল-কোরআনের দাবির প্রতি ঈমান ও আস্থা ততই মজবুত থেকে মজবুততর হতে থাকবে। এভাবে ইতিহাস বিশ্লেষণের অতি সংক্ষিপ্ত অথচ সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আল-কোরআন দিয়েছে বিভিন্ন সময়ের নবী-রাসূল সা. গণের ইতিহাসের আলোচনার মাধ্যমে।

পাঁচ : আল-কোরআন অতীত যুগের আম্বিয়ায়ে কেরামের ইতিহাসের আলোচনা গুরুত্বসহকারে পেশ করেছে। কোরআনের দাওয়াত গ্রহণ ও প্রত্যাখ্যানের প্রতিফল পরিণতি সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানার জন্য অন্যান্য আসমানী কিতাব Study করা যেতে পারে। তবে এক্ষেত্রে সমস্যা হলো নির্ভরযোগ্য কিছু পাওয়ার তেমন উপায় নেই। এ পথে সাধারণের পা বাড়াবার কোন প্রয়োজন নেই। গবেষকরা যেতে পারেন। তবে তাদের যথেষ্ট সতর্কতা ও সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। অতীতের কোন কোন তাফসিরকারক ইসরাইলী কাহিনীকে যথার্থ বিচার বিশ্লেষণ ছাড়াই তাফসিরী রেওয়ায়েত হিসেবে চালিয়ে দিয়েছেন। ফলে কোন কোন সম্মানিত নবী-রাসূল সম্পর্কেও ভুল ধারণা সৃষ্টির অবকাশ রয়েছে। অথচ ইতিহাস বিশ্লেষণের যোপে ঐসব কল্প-কাহিনী টিকে না।

ছয় : কোরআন তার মূল বক্তব্য তৌহিদ, রিসালাত ও আখেরাতের সত্যতা প্রমাণ করার জন্যে বিশেষ করে তৌহিদ ও আখিরাত প্রমাণের জন্য সৃষ্টিলোকের বিভিন্ন রহস্য উপলব্ধির আহবান জানিয়েছে।

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ (العمران: ١٩٠)

"সন্দেহ নেই আসমান জমিনের সৃষ্টির মধ্যে এবং দিবা রাত্রির পরিবর্তন পরিবর্ধনের মধ্যে জ্ঞানীদের জন্য আল্লাহর তৌহিদের নিদর্শন বিদ্যমান।" (আলে-ইমরান : ১০৯)

وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ ۚ أَحْيَيْنٰهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُوْنَ (يس: ٣٣)

"তাদের জন্য আল্লাহর তৌহিদের নিদর্শন হল এই মরা জমিন। যাতে আমি জীবন দান করি, যা থেকে ফসল উৎপাদন করে তারা খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে থাকে।" (ইয়াসীন : ৩৩)

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ - وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الَّيْلُ ۚ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُّظْلِمُوْنَ (يس: ٣٦-٣٧)

"পূত পবিত্র সেই মহান সত্তা যিনি সবকিছু জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন। মাটি থেকে যা কিছু উপন্ন হয় তাও এবং মানুষের নিজের সৃষ্টির এর ব্যতিক্রম নয়। এমনি আরও অনেক সৃষ্টি রয়েছে, সে সম্পর্কে তাদের কোন জ্ঞান নেই। রাতও তাদের জন্য একটি নিদর্শন যার অন্ধকারে তারা নিমজ্জিত থাকা অবস্থায় অন্ধকার চিরে আমি দিনের আলো বের করে আনি।" (ইয়াসীন : ৩৬-৩৭)

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ - خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ - يَّخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ . (الطارق: ٥-٧)

"মানুষের উচিত তার নিজের সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কেই ভেবে দেখা, তাকে তো সৃষ্টি করা হয়েছে এক কাতরা পানি থেকেই যা নির্গত হয় বক্ষ ও পৃষ্ঠদেশ থেকে।" (তারেক : ৫-৭)

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيٰنِ - بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيٰنِ - (الرحمن: ١٩-٢٠)

"তিনি পানির প্রবাহকে দুটি স্বাধীন ধারায় প্রবাহিত করেছেন যে দুটি ধারা পাশাপাশি লাগালাগি প্রবাহিত হয় অথচ একে অপরের সীমা লংঘন করে না।" (রহমান : ১৯ -২০)

"অতএব তোমরা তোমাদের রবের কোন সে নিয়ামত, কোন সে কুদরতকে অস্বীকার করবে? উভয় ধারা এবং প্রবাহ্ থেকে নির্গত হয় মণিমুক্তা এবং প্রবাল-সমূহ। অতএব তোমরা তোমাদের রবের কোন সে নেয়ামত ও কুদরত অস্বীকার করবে?" এগুলোর যথার্থ উপলব্ধির জন্য ভূগোল, বিজ্ঞান প্রভৃতি শাস্ত্রের জ্ঞান গবেষণালব্ধ নির্ভরযোগ্য তথ্যসমূহ খুবই সহায়ক। এক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য তথ্যের যত গভীরে যাওয়া যাবে কোরআনের উপস্থাপিত বক্তব্যের প্রতি আস্থা ও প্রত্যয় ততই বৃদ্ধি পেতে বাধ্য।

আল-কোরআন থেকে হেদায়েত পাবে কারা

আল-কোরআন সব মানুষের জন্য নাজিলকৃত আল্লাহর কিতাব। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সা.-এর সময় থেকে নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ আসবে সব মানুষের জন্যই এ কিতাব কল্যাণ-অকল্যাণের দিশারী। কিন্তু সবাই এ থেকে হেদায়েত লাভে সক্ষম হবে না। মানুষের মধ্য থেকে এক শ্রেণীর মানুষ যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণ করে, এই কিতাবের অনুসরণ করতে আগ্রহী, আল্লাহর সন্তোষ অর্জন এবং অসন্তোষ বর্জনে যত্নবান এবং আখিরাতের পরিণাম পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক সাবধান কেবল তাদের পক্ষেই কোরআন থেকে হেদায়েত লাভ করা সম্ভব। কোরআনের ঘোষণা :

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيْهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ - الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ
وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ - وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ
اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ (البقرة: ۲-۴)

"এটা আল্লাহর কিতাব, এতে কোন প্রকার সন্দেহ নেই। এটা জীবন-যাপনের ব্যবস্থা (হেদায়েত) সেইসব মুত্তাকীদের জন্য যারা গায়েবে বিশ্বাস করে, সালাত কায়েম করে, আমার দেয়া রিজিক থেকে ব্যয় করে, তোমার প্রতি ও তোমার পূর্বে যা কিছু নাজিল করেছি সে সবের প্রতি ঈমান পোষণ করে। আর আখিরাতের প্রতি রাখে দৃঢ় বিশ্বাস।" (বাকারা : ২-৪)

طٰهٰ ۚ مَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لِتَشْقٰٓى - اِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَنْ يَّخْشٰى. (طه : ١-٣)

"ত্ব-হা! আমি তোমার প্রতি কোরআন এ জন্য নাজিল করিনি যে, এটা তোমার দুর্ভাগ্যের কারণ হবে। বরং এটা তো নাজিল করেছি আল্লাহভীরু লোকের জন্য হেদায়েত ও নসিহত লাভের উপকরণ রূপেই।" (তা-হা : ১-৩)

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۙ وَلَا يَزِيْدُ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا خَسَارًا (بنى اسرائيل : ٨٢)

"এই কোরআন রূপে আমি যা কিছু নাজিল করেছি তা তো মুমিনদের জন্য শেফা ও রহমত স্বরূপ। কিন্তু জালেমদের ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি হবে না।" (বনী ইসরাঈল : ৮২)

اِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ (يس : ١١)

"হে নবী? আপনি কেবল তাদেরকেই সতর্ক করতে সক্ষম হবেন যারা আল্লাহ প্রদত্ত হেদায়েতের অনুসরণ করবে এবং না দেখে রহমানকে ভয় করবে।" (ইয়াসীন : ১১)

হাদীসে রসূলে কোরআনকে মেঘের সাথে তুলনা করে বলা হয়েছে, বৃষ্টির পানি থেকে কেবল সেই জমিনই ফসল দেবার যোগ্য হয়; যে জমিন বৃষ্টির পানিকে বুকে ধারণের জন্য পূর্ব থেকে উন্মুখ হয়ে থাকে। যে মাটি বৃষ্টির পানিকে ধারণ করতে প্রস্তুত নয় সে মাটি হাজারো বর্ষণেও ফসল দেবার যোগ্যতা অর্জন করতে পারে না। তেমনি মানুষের মধ্য থেকে যারা আল্লাহর পক্ষ থেকে নাজিলকৃত হেদায়েত গ্রহণ করার জন্যে উন্মুখ হয়ে থাকে, মনকে সেভাবে প্রস্তুত করে কেবল তারাই কোরআন প্রদর্শিত পথে পরিচালিত হতে পারে-অন্যরা নয়।

হে আল্লাহ! আমাদের সত্যকে সত্য হিসেবে বুঝবার তৌফিক দাও, তৌফিক দাও সে সত্যের অনুসরণ করার, আর অসত্যকেও অসত্যরূপে চিনে তা বর্জন করার শক্তি দাও। আমিন।

সমাপ্ত